ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২০ সংখ্যা ।। ৫ মাঘ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১৯ জানুয়ারি, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

মেদিনীপুরের দাঙ্গা পূর্ব-পরিকল্পিত

খাস জায়গায় অবৈধ নির্মাণ বিরোধিতায় উত্তাল ভবানীচক

সংবাদদাতা ।। গত ২ জানুয়ারি মুসলিম সম্প্রদায়ের একদল দুষ্কৃতীর আক্রমণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভবানীচক সহ ওই এলাকায় বহু নিরীহ মহিলা ও পুরুষ গুরুতরভাবে আক্রান্ত হন। বাড়ি ভাঙ্গচুর, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, মারধর প্রভৃতি ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকে। এখন পুরো এলাকায় এক সন্ত্রাসময় আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম

এই প্রথম শহরে হাত তুলে যাতায়াত করল মানুষ

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ।। গত ৮ নভেম্বর সকাল থেকে মেদিনীপুর শহরের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ, উত্তেজনাময় হয়ে উঠে। গুজবের পর গুজবে মানুষের মধ্যে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শহরের সিপাইবাজার অঞ্চলে মহরমের শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় নিয়ে মিছিলকারীরা প্রকাশ্যে হিন্দু বিরোধী উত্তেজক শ্লোগান দিতে দিতে শহর জুড়ে ব্যাপকভাবে হামলা চালায়। সাম্প্রতিককালে এমন বড় আকারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-

ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় মানুষের মতে, স্মরণাতীত কালের মধ্যে এই প্রথম শহরে হাত তুলে যাতায়াত করতে হল মানুষকে।

দাঙ্গাকারীদের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে মোটরবাইক দুটি।

ঐতিহাসিক শহর, শান্তি ও সম্প্রীতির শহর বলে পরিচিত মেদিনীপুর শহরে এক উত্তেজনাময় থমথমে অবস্থায়। তিনজন পুলিশ কর্মীসহ উভয় সমাজের আটজন মানুষ কম বেশি আহত হয়েছেন।

(এরপর ৪ পাতায়)

হাঙ্গামা মেদিনীপুর জেলায় কেন, সারা পশ্চিমবঙ্গেই দেখা যায়নি। এতবড় একটা ঘটনা অথচ কলকাতার সংবাদমাধ্যমে তার প্রতিফলন নেই। সাংবাদিক বন্ধুদের বক্তব্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর প্রকাশিত হলে উত্তেজনা ছড়াতে পারে। তাই লেখা হয় না। আস্থার অভাব দেখা যায়। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূলের অভিযোগ, পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় মানুষের মতে, স্মরণাতীত কালের মধ্যে এই প্রথম শহরে হাত তুলে যাতায়াত করতে হল মানুষকে।

সত্য ঘটনাকে চাপা দেওয়া হয়। ভাল কথা, তবে কলকাতার এই তথাকথিত সেকুলার সংবাদমাধ্যমই ২০০২ সালে গুজরাতের দাঙ্গার জন্য একতরফাভাবে গুজরাতি হিন্দুদের দায়ি করেছিল। দিনের পর দিন লেখা হয়েছিল সেখানে শান্তিপ্রিয় (?) ভালমানুষ (?) মুসলিমদের বর্বর হিন্দুরা অকারণে কোতল করেছে। বামপন্থী সেকুলার নীতির ধ্বজাধারীরা মোটা মোটা কেতাব লিখেছেন। মীরা নায়ার বিদেশে বিশেষভাবে আমেরিকায় হিন্দু বিরোধী প্রচারের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সাহেব-মেমদের প্রচুর হাততালি কুড়িয়েছেন। পাকিস্তান তো মীরা নায়ারের তোলা গুজরাত দাঙ্গায় মুসলমানদের কোতল হওয়ার কাল্পনিক ঘটনা বা গল্পের চলচ্চিত্রটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে। তখন কিন্তু আমাদের সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকরা একবারও বলেননি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর প্রচার করলে উত্তেজনা ছড়ায়। ক্ষতি হয়। উল্টে দিনের পর দিন অসত্য কাল্পনিক মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করে গুজরাতের দাঙ্গায় ইন্ধন যুগিয়েছে।

আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কলকাতার কোনও একটি সংবাদপত্র লেখেনি যে গোধরায় ট্রেনের কামরায় আগুন দিয়ে ৫৮ জন হিন্দু করসেবকদের নির্মমভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল সেখানের হিংস্র মুসলিম

(এরপর ৪ পাতায়)

বিনা প্ররোচনায় বজরঙ্গ ক্লাবে অগ্নিসংযোগ

গড়পুরুষ ।। গত ৮ জানুয়ারি মহরম উৎসবের দিন মেদিনীপুর শহরে তাজিয়া নিয়ে মিছিলকারীরা প্রকাশ্যে হিন্দু বিরোধী উত্তেজক শ্লোগান দিতে দিতে শহর জুড়ে ব্যাপকভাবে হামলা চালায়। সাম্প্রতিককালে এমন বড় আকারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-

পর এক ঘটতে থাকে। এখন পুরো এলাকায় এক সন্ত্রাসময় আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম মাসাধিক কাল ধরে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। উল্লেখ্য, দেড় মাস আগে ২৩ নভেম্বর এক শ্রেণীর মুসলিম দুষ্কৃতী এগরা মহকুমার ব্লক-২-এর অন্তর্ভুক্ত বাসুদেবপুর মৌজার বাসন্তীপুকুর সংলগ্ন সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত খাস ময়দানে রাতারাতি একটি অবৈধ অস্থায়ী আস্তানা নির্মাণ করে। রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পথ অবরোধ সহ বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানান স্থানীয় মানুষজন। প্রশাসন প্রথমে ত্রিপাক্ষিক ও পরে সর্বদলীয় বৈঠক করেন এবং সেখানে মহকুমা শাসক এস ডি পি ও, এগরা থানার ও সি অবৈধভাবে নির্মিত আস্তানাটি অপসারণের প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু মাস পেরিয়ে গেলেও ওই অবৈধ নির্মাণ না সরানোয় জাতীয় সুরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে স্থানীয় হিন্দুসমাজ গত ৩ জানুয়ারি অবরোধ কর্মসূচীর ডাক দেয় — কাঁথি, খড়গপুর বাসরুটে ভবানীচক বাজারে। এই অবরোধ কর্মসূচীর প্রচারের কাজে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য নির্মলেন্দু গিরি যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখন একদল মুসলিম গুন্ডা তাঁকে ও স্থানীয় এক হিন্দু চা-দোকানদারকে প্রচণ্ড মারধর করে। উল্লেখ্য, নির্মলেন্দু বাবু ওই এলাকায় চারবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, ওইদিন সকালেও বাসন্তীপুকুরের সংলগ্ন রাস্তায় চলাচলকারী হিন্দু মহিলাদের উপরও ওই গুন্ডারা চড়াও হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য এগরা, মেদিনীপুর, কাঁথিতে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। নির্মলেন্দু বাবুকে এগরা থানার ও সি দুষ্কৃতীদের হাত থেকে উদ্ধার করে কাঁথি হাসপাতালে ভর্তি করেন গুরুতর আহত অবস্থায়। ইতিমধ্যে মুসলিম দাঙ্গাকারীরা ভবানীচকে পথ অবরোধ ও দোকান-পাট ভাঙ্গচুরে সামিল হয়। বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে। পুলিশ অসহায় দর্শকের ভূমিকায় থাকে।

এ পর্যন্ত প্রায় ১৪ জন নিরীহ ও নিরপরাধ হিন্দুকে নানান মারাত্মক ধারায় অভিযুক্ত করে কাঁথি জেল হাজতে রাখা হয়েছে। আরও প্রায় ৫৪টি মোকদ্দমা কাঁথি আদালতে পাঠানো হয়েছে। ২ জানুয়ারি ভবানীচক-এর গোলমালে

(এরপর ৪ পাতায়)

লেখা হলেও এমনভাবে বলা হয় যেন তা দু'দল দুষ্কৃতীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। অর্থাৎ সত্য ঘটনাকে চাপা দেওয়া হয়। ভাল কথা, তবে কলকাতার এই তথাকথিত সেকুলার সংবাদমাধ্যমই ২০০২ সালে গুজরাতের দাঙ্গার জন্য একতরফাভাবে গুজরাতি

গুজবের পর গুজবে মানুষের মধ্যে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শহরের সিপাইবাজার অঞ্চলে মহরমের শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় মন্দিরের সামনে আগুনের টুকরো পড়া থেকে স্থানীয় যুবকদের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে এই উত্তেজনার সূত্রপাত। ওইদিন সকালে ওই অঞ্চল দিয়ে মহরমের আখড়া আসার সময়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের কিছু মানুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা দেখে কয়েকজন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতারা পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। দুপুরের দিকে সি আর পি এবং কমব্যাট ফোর্স ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলা দেড়টা নাগাদ শহরে ১৪৪ ধারা জারী হয় ও সর্বদলীয় বৈঠক হয়। বিকালে প্রশাসনের উদ্যোগে শান্তি মিছিল বের হয়। বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে থেকে এই মিছিল নিমতলাচক হয়ে জোড় মসজিদ অঞ্চলে গেলে কিছু মুসলিম জনসাধারণ মিছিলের গতিরোধ করে। মেদিনীপুর টাউন মুসলিম কমিটির নেতা কালু খান পুলিশের বিরুদ্ধে একতরফা দমন পীড়নের অভিযোগ আনেন। জেলা প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মিছিল নিয়ে ফিরে যান। পরের দিনও (৯ জানুয়ারি) শহরে বাইরের বাস ও ট্যাক্সি ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষ জেলা শহরে কাজে আসতে পারেনি। কিছু অঞ্চলে দোকান পাটও বন্ধ ছিল। প্রশাসনের উপর মানুষের

জ ভরতুকি, সাগরে তীর্থকর

মের ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা

করা হয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের জন্য নিবেদিত প্রাণ বাম সরকার হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য মোটেই চিন্তিত নয়। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন এক মুসলিম মহিলা। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার গঙ্গাসাগর নিয়েও রাজনীতি করার সুযোগ ছাড়তে চাননি। ডাক দিয়েছেন তীর্থকর বয়কটের। এমনকী বাবুঘাটে গঙ্গাসাগরের অস্থায়ী শিবিরে গিয়েও সাধুসন্তদের মধ্যে প্রচার করেছেন, তীর্থকর বয়কট করুন। সিপিএমের চাপিয়ে দেওয়া কর দেবেন না। এ যেন রত্নাকর দস্যুর 'রাম রাম' বলার মতো। মুসলিমদের নিয়ে

হ

সি পি এ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হজে ভরতুকি অথচ গঙ্গাসাগরে তীর্থকর আদায় চলছেই। সিপিএমের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির এই হ নমুনা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগরে মকরস্নান করতে আসেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে তীর্থকর আদায় করছে সিপিএম সরকার। কর এব গাড়ি ভাড়া বাবদ এই টাকার পরিমাণ প্রতিবারই বাড়ছে। অথচ হজযাত্রীদের জন কেন্দ্রীয় সরকারের ভরতুকির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারও একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। হজের ফরম ভরতি থেকে শুরু করে বিমানে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সরকার মোটা টাকা খরচ করে। অথচ গঙ্গাসাগরের ক্ষেত্রে উল্টো চিত্র। বিশ্ব হিন্দু

এই সময়

মোবাইল বিভ্রাট

যন্ত্রই এখন যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সস্তা চীনা মোবাইল এখন জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঘোর সঙ্কট তৈরি করেছে। সাধারণত চীনা মোবাইলে ই এস এন নম্বর থাকে না। প্রতিটি মোবাইলেই ই এস এন নম্বর থাকার কথা। এই নম্বর থেকেই জানা যায় কোন ব্যক্তি কোথা থেকে, কোন পরিষেবায় কথা বলছে। চীনা মোবাইলে এই নম্বর না থাকার ফলে তা জানা যাচ্ছে না। যা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদ সংকেত। জঙ্গিরা অনায়াসেই এর ফায়দা তুলতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তরও এবিষয়ে রীতিমতো চিন্তিত। অবিলম্বে মোবাইল পরিষেবাদাতাদের ই এস এন নম্বর বিহীন ফোনের পরিষেবা বন্ধের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাজারে চীনা মোবাইল বেশি থাকায়, এখনও তা সম্পূর্ণ হয়নি।

বধিরদের ভক্তি

তারা কানে শুনতে পায় না— বধির। কিন্তু তাতে কী! ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকলে কি না হয়। বধিরদের মধ্যেও এখন ধর্মীয় চেতনা বাড়ছে। অনেক বধিরই আধ্যাত্মিকতার পথে শান্তি পাচ্ছে। তারা কানে শুনতে না পেলেও, ঈশারায় কিংবা অন্যদের মুখ নাড়াকে লক্ষ্য করে নিজেরাও তাদের সঙ্গে হরিনাম-সংকীর্তন করছে। এই কাজে 'ইসকন' তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বধির কৃষ্ণ ভক্তরাও ধর্মকথা প্রচার করছে। তারাও দেখিয়ে দিচ্ছে ভক্তিই সব। ভক্তির কোনও প্রকারভেদ হয় না।

সম্মানিত রামায়ণ

আধ্যাত্মিক ধারাবাহিক ক্রমশই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। শুধু জনপ্রিয় কেন, অনান্য ধারাবাহিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুরস্কারও জিতে নিচ্ছে। সম্প্রতি এন ডি টি ভি-ইমাজিনে সম্প্রচারিত রামায়ণ ধারাবাহিকটি দুবাই-এর মতো দেশে সম্মানিত হয়েছে। পুরস্কার লাভ করেছে। দুবাই-এ তিনটি 'গোল্ড অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছে রামায়ণ। এই পুরস্কার মূলত আধ্যাত্মিকতারই জয় বলে অনেকের অভিমত।

উল্টো পুরাণ

বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের গরিব দরদী বললেও, বাস্তবে উল্টো কাজ করছে। খোদ গরিবদরদী রাজ্যেই গরিবদের মাথায় ছাদ জোটেনি। স্বয়ং কেন্দ্রীয় আবাসন ও শহর দারিদ্র্য দূরীকরণমন্ত্রী কুমারী শৈলজা এই অভিযোগ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যেরই গরিব মানুষ ও কম উপার্জনকারীদের বাড়ি নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করেছে। পশ্চিম-বঙ্গেও ১ লক্ষ ১৫ হাজার ২৪৪টি বাড়ি তৈরির উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই টাকার সামান্য অংশেরই কাজ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

এমনও হয়

তারা মাংস খায় না। শুধু এক বা দু'জন নয়। এই চিত্র পুরো গ্রামের। অবাক করার ঘটনা হল তারা সকলে মুসলিম। শুধু মাংস কেন! নামাজের পর তারা সকলে কবীরের ভজন গায়। দীর্ঘ ৯০ বছর ধরে গ্রামের কেউই মাংস ভক্ষণ করেনি। অন্য কেউ করলে তার শাস্তি মৃত্যুও হতে পারে। এই চিত্র উত্তরপ্রদেশের পাঁচুপুরবা গ্রামের। পাঁচু সাই নামে এক মহন্ত কবীরপন্থী এক গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। পাঁচু সাই-এর পরিবারের অনেকে এখনও এই গ্রামে বসবাস করে। তারাই সাতপুরুষ ধরে এই বিধান চালু রেখেছে।

কালো সময়

আগামী প্রজন্ম হয় তো শিশু পত্রিকার মুখ দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। 'কচিপাতা', 'শিশুমেলা' 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর মতো কয়েকটি শিশু পত্রিকা চালু থাকলেও অবস্থা অতটা ভালো নয়। এখন প্রকাশকদের অনেকেই শিশু পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী নয়। ব্যবসায়িক স্বার্থে তাদের নজর বড় বই ও উপন্যাস ছাপানোর দিকে। ফলে শিশু পত্রিকা নতুন করে বের হবার আশা খুবই কম। হয় তো আগামী দিনে সম্ভবনার সমূলে বিনাশও হতে পারে। অনেক নামজাদা সাহিত্যিকও এই ঘটনায় চিন্তিত। এমনিতেই যন্ত্রের যুগে বই পড়ার অভ্যাস কমে গেছে। তার ওপর প্রকাশকদের এই মনোভাব অনেক অভিভাবককেও চিন্তায় ফেলেছে।

খোদ কলকাতাই বাংলাদেশী জঙ্গিদের ঘাঁটি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। খোদ কলকাতা এবং কলকাতার শহরতলীতে বেশ কিছুদিন ধরে একের পর এক বাংলাদেশী জঙ্গিসন্ত্রাসীরা ধরা পড়েছে। গত ৪ জানুয়ারি কলকাতার গড়িয়া থেকে এরকমই চারজনকে অপরাধ দমন শাখার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের নাম যথাক্রমে নজরুল ইসলাম, ওইদুল ইসলাম, জাকির হুসেন এবং শাহিদ আহমেদ মনজুর। তারা একসঙ্গে গড়িয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করছিল। পুলিশের হিসেবে এলাকাটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে পড়ে। কলকাতা থেকেই এই দলটি বাংলাদেশে তোলাবাজি করতো বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। সি আই ডি-র ডি আই জি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা জানিয়েছেন, অন্ততঃপক্ষে দু'বছর ধরে তারা ওই এলাকায় ছিল। ভুয়ো নথিপত্র দেখিয়ে জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং প্যান কার্ড-বের করে রেশন কার্ড এবং স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র আদায় করার মতলবে ছিল। আর তা হলেই তাদের পক্ষে ভারতীয় পাসপোর্ট যোগাড় করাটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সি আই ডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল অভিযুক্ত নজরুল বাংলাদেশে আওয়ামি লীগের সাংসদ মহম্মদ আসাদুল্লা (২০০৪) হত্যা মামলার প্রধান আসামী। কলকাতায় বসেই তারা তাদের বাংলাদেশী সাগরেদদের দিয়ে টাকা তোলা তুলে হাওলার মাধ্যমে কলকাতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিল। তবে চারজনের ওই দলটি যথেষ্ট টাকা পয়সা এনে ভারতেই পাকাপাকি আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করার ফিকিরে ছিল।

এই র‍্যাকেটের এক কিং-পিন মুজিবর রহমান জামিল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে ধরা পড়েছিল। সে জাল কারেন্সি নোটের ব্যবসা করত। এস টি এফ-এর প্রধান রাজীব কুমার জানিয়েছেন, তেঘরিয়াতে বাড়িও কিনেছিল জামিল। সে ও তার ভাই মহম্মদ মনসুর রহমান গত ৬ জানুয়ারি এসপ্লানেডে এস টি এফ-এর হাতে ধরা পড়ে। ওই দু'জনই ভুয়ো নামে ভারতীয় পরিচয়পত্র বের করে ফেলেছিল। তেঘরিয়ার বাড়ি কেনা হয়েছিল আয়ুব মন্ডলের নাম দিয়ে।

দুই পুলিশ অফিসার সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং রাজীব কুমার জানিয়েছেন, কলকাতার বাড়িওয়ালারা ভাড়া দেওয়ার আগে ভাড়াটের পরিচয় সম্পর্কে খোঁজখবর করেন না বললেই হয়। যদিও তাদের স্থানীয় থানাকে ভাড়াটের সম্পর্কে জানানো উচিত। অপরপক্ষে কলকাতায় সহজেই ভুয়ো নথিপত্র পাওয়া যায়। আর অনুমোদিত জমি-বাড়ির বিক্রেতারা প্রামাণ্য নথিপত্র ছাড়াই যাকে- তাকে বিক্রি করে দিচ্ছে।

শ্রীগুপ্তা জানিয়েছেন, নজরুলের দলবল গড়িয়া এলাকায় নাকি সুনাম কুড়িয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশও নিয়মিতভাবে যেসব বাংলাদেশী অপরাধী ভারতে গা-ঢাকা দিচ্ছে তার খবর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে চলেছে।

হৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দাবিতে নেপালী কংগ্রেসের সংসদ বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নেপালের সংসদে অচলাবস্থা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কারণ মাওবাদী সরকারের কোয়ালিশন পার্টনার এবং প্রধান বিরোধী দল নেপালী কংগ্রেস সংসদ একই সঙ্গে বয়কট করছে। বয়কটের কারণ সশস্ত্র মাওবাদী গেরিলার রাজার শাসন চলাকালীন অনেকের অনেক বিত্ত-সম্পত্তি জবরদখল করে নিয়েছিল — ভয় দেখিয়ে অথবা গাজোয়ারি করে। এখন মাওবাদী দলনেতা (সি পি এন-ইউ এম এল) তথা নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রচন্ড ওরফে পুষ্পকমল দহলকে চাপ দিচ্ছে নেপালী কংগ্রেস। কংগ্রেস-এর দাবি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ওই দখলীকৃত সম্পদ ফেরৎ দিতে হবে।

'নেপালী কংগ্রেস' নেপালের সংসদে বৃহত্তম দল। তারা এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী। তাদের দাবি — তিনমাসের মধ্যে মাওবাদী গেরিলারা ওই অপহৃত সম্পত্তি ফেরৎ দিক। মাওবাদীরা এই কথাগুলো কার্যকর করলেই বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান হতে পারে।

মাওবাদীরা দশবছর যাবৎ সন্ত্রাস চালিয়ে গত ২০০৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জি পি কৈরালার মধ্যবর্তী সরকারের সঙ্গে এক শান্তিচুক্তি করেছিল। তার আগে তারা এক দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ চালিয়েছিল। যারাই তাদের বিরোধিতা করত তারা তাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাদের ধনসম্পত্তি দখল করত। বিরুদ্ধ বাদী প্রচার মাধ্যমকেও তারা ছেড়ে কথা বলত না। গত ১ জানুয়ারি বর্তমান কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলি যা একরকম সংসদ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে সেখানে বিরোধীরা ষষ্ঠবার বয়কট করে। সংসদ চালু করতে নেপালী কংগ্রেস এখন নয় দফা দাবি পেশ করেছে। দাবিগুলো হল —

হৃত সম্পত্তি পুনরায় প্রত্যর্পণ করা।

আধা সামরিক ধাঁচের মাওবাদীদের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগকে বিলুপ্ত করা।

ভয়-ভীতি প্রদর্শন বন্ধ করা।

তোলা আদায় বন্ধ করা প্রভৃতি।

প্রচণ্ড-এর পক্ষ থেকে নতুন করে নেপালী কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। মাওবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক সুনীল মানানধর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড নেপালী কংগ্রেসের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলবেন। কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ নেপাল মাওবাদী বাদে অন্য সব দলই মাওবাদী গেরিলাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের নির্বাচন ও প্রত্যাশা

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে (২৯.১২.২০০৮) আওয়ামী লীগের বিরাট জয় প্রমাণ করিয়া দেখাইল যে সেই দেশের সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে। মোল্লাতন্ত্র, স্বাধীনতা বিরোধী এবং যুদ্ধ অপরাধীদের এই নির্বাচনে বর্জন করিয়াছে বাংলাদেশের জনগণ। ধুইয়া-মুছিয়া সাফ করিয়া দিয়াছে বি এন পি-জামাত জোটকে। জনতার শক্তি যে কতটা অপ্রতিরোধ্য ও অবিনাশী হইতে পারে এই নির্বাচনে তাহা আবার প্রমাণিত হইয়াছে। জনতার শক্তির নিকট ক্ষমতার সকল দম্ভ, নেতৃত্বের আস্ফালন এবং দেশপ্রেমের সোল এজেন্সি কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গিয়াছে। এই নির্বাচনে প্রমাণ হইয়াছে যে, জনতার রায়কে বানচাল করিয়া দেওয়ার হীন চক্রান্ত কখনোই সফল হয় না। কিছু সময়ের জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাইলেও সব সময়ের জন্য সব মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। জনগণ সিদ্ধান্ত লইতে ভুল করে না। এইবারের নির্বাচনকে অনেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনতার নীরব ভোট বিপ্লব বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

বিজয়ী ও বিজিত পক্ষ এই নির্বাচনের ফলাফলকে কীভাবে দেখিবে, তাহা তাহারাই জানেন। কেননা এই নির্বাচনের ফলাফল অনেকের হিসাব নিকাশই পাল্টাইয়া দিয়াছে। এমনকী সুশীল সমাজের জনমত জরিপও অপাঙক্তেয় হইয়া গিয়াছে — ইহাকেই বলে জনতার শক্তি। এই জনতরঙ্গ রুখিবে কে?

আসন সংখ্যার হিসাবে ফলাফল যাচাই না করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাহাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চ নাজনিত ক্ষোভ, বেদনা ও প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছে। এই জনগণ অর্থে শহরের সুবেশ পরিহিত ভদ্রলোক নয়, নাগরিক সমাজের জাঁদরেল প্রতিনিধি নন, এই জনতা হইল অজস্র অগণন-নিরন্ন দরিদ্র মানুষ। যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি, সেই নির্বাচন কেন পিছাইয়া গেল, কেন দুইটি বছর বাংলাদেশের মানুষকে এত দুর্ভোগ পোহাইতে হইল, এত হয়রানি, এত মানবাধিকার লঙঘনের দায় ভোগ করিতে হইল তাহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। বস্তুত, ২০০৭ সালে নির্বাচন হইলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের ফল এতটা করুণ হয়তো হইত না। প্রশ্ন উঠিবে, এই পরিবর্তন কাহারা আনিয়াছে? এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে যদি কেউ অনিবার্য করিয়া থাকে তাহারা হইল ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত ও অন্ধ কতিপয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। যাহারা তাহাদের পাঁচ বছরের শাসনকালের সকল অপকর্ম, অন্যায়, হিংসা ও বিদ্বেষ ব্যর্থতা আড়াল করিতে একজন শিখন্ডি রাষ্ট্রপতিনির্বাচিত করিয়াছিলেন। একজন পছন্দসই প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে বিচারপতিদের বয়ঃসীমা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। একজন বাকপটু ও দলের প্রতি আনুগত্যশীল অযোগ্য বিচারপতিকে প্রধান নির্বাচক কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের ঘটনা — প্রকাশ্য রাজপথে মানুষ হত্যার মহড়া অবশ্যই নিন্দাযোগ্য এবং ইহার বিচারও প্রয়োজন। কিন্তু সেই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত করিয়াছিল কাহারা? কাহারা বায়তুল মোকররম মসজিদকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছিল? এই হত্যার দায় বি এন পি ও তাহার শরিক দল অবশ্যই এড়াইতে পারে না। বিপুল ভোটে বিজয়ী একটি জোটের ক্ষমতা হইতে বিদায় লইবার মুহূর্তটি কেন এতটা ক্লেদাক্ত হইল সেই প্রশ্নের জবাব তাহাদেরই খুঁজিতে হইবে। দেশ শাসনে, জনগণের কল্যাণে তাহারা পুরোপুরি ব্যর্থ হইয়াছিলেন। জনতার প্রতিবাদের ভাষা ও প্রতিকারের অস্ত্রকে বুলেটের তলায় পিষ্ট করিয়াছিলেন। সেদিন বি এন পি ও চার দলীয় নেতৃত্ব ক্ষমতার মোহে অন্ধ ছিলেন। তাহা না হইলে দেখিতে পাইতেন ক্ষুব্ধ মানুষের মুখ। শুনিতে পাইতেন প্রতিবাদের ভাষা।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ফলাফলকে পন্ডিত ব্যক্তিরা ভোট বিপ্লব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনগণ কিন্তু এত পরিবর্তন, এত অঙ্গিকার, এত প্রতিশ্রুতির গালভরা বুলি শুনিতে চাহেন না। আগামী পাঁচ- দশ বৎসর কী হইবে তাহাও তাহাদের ভাবনায় নাই। তাহারা একটি জিনিসই চায়, তাহা হইল একটু শান্তিতে থাকা, একটু সুবিচার। তাহারা উচ্চমার্গের রাজনৈতিক কূটতর্ক শুনিতে চাহে না। এই কারণেই গরীব মানুষ, দুঃখী মানুষ বাক্স ভরিয়া নৌকায় ভোট দিয়াছে।

আওয়ামী লীগ শাসনকালে যে সন্ত্রাস-মস্তানি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে তাহা ছিল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন এলাকায়। বি এন পি জোট শাসনকালে তাহা ছড়াইয়া দেওয়া হয় সারা দেশে। সেদিন বিজয়ীর হিংস্রতা সমগ্র জাতিকে স্তব্ধ ও বিমূঢ় করিয়া দিয়াছিল। এ কোন বাংলাদেশ, যেখানে ভোট দেওয়ার জন্য সম্ভ্রম হারাইতে হয়, লাঞ্ছিত হইতে হয়, ভিটেমাটি হইতে উচ্ছেদ যন্ত্রণা ভুগিতে হয়। দেশের ভিতর উদ্বাস্তু জীবন যাপন করিতে হয়। শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নামিয়া আসিয়াছিল ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস ও হিংসা। এবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে না বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ভীষণ অসহায় ও নিরুপায়। তাহারা বারবার আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য ও অপরকে বাঁচাইতে সহায় খোঁজে নেতা, নেত্রী ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। বারবার তাহারা ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করে, সরকার গঠন করে। এমনকী বন্দুকের নলে ক্ষমতায় আসা শাসককেও তাহারা অবিশ্বাস করে না। ভাবিয়া থাকে,নির্বাচিত সরকার যাহা করিতে পারে নাই, অনির্বাচিত সরকার তাহা করিয়া দিবে। কিন্তু ক্ষমতালাভ করিয়া স্বৈরশাসকদের মতো নির্বাচিত শাসকরাও জনগণের সমর্থন ও ভালোবাসাকে ভুলুণ্ঠিত করিয়াছে।

সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনকে তাই যেমন নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন হিসাবে লইয়া ছিল, তেমনই এর মাঝে খুঁজিয়া ছিল বাঁচার আশ্রয়। আমাদের আশা, এইবারের বিজয়ী শক্তি অতীতের হিংসা ও বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বিরোধের ঘেরা টোপ হইতে বাহিরে আসিয়া সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষত সেই দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতিত হিন্দু সমাজের জন্য কাজ করিবে। যে ভুল পূর্বে করা হইয়াছে, সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না বলিয়াই আমাদের প্রত্যাশা।

শিল্প, বাণিজ্য ও রাজস্ব সংগ্রহের হাল-হকিকত

ইউ পি এ এবং এন ডি এ সরকারের তুলনামূলক সমীক্ষা

এন সি দে

একথা জানার জন্য অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, সরকারের কোষাগারের হাল নির্ভর করে বাণিজ্য অর্থাৎ সঠিক সওদাগিরির ওপর। বিদেশের বাজারে দেশের দ্রব্য বিক্রি করলে সরকারের কোষাগারে অর্থ আসে;আর বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করলে কোষাগার থেকে অর্থ বেরিয়ে যায়। অতএব একটি প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রথম লক্ষ্যই হল দেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী বাড়ানো অর্থাৎ আয় বাড়ানো। আর বিদেশী দ্রব্য আমদানী কম করা অর্থাৎ ব্যয় কমানো। প্রাচীনকালে ভারতীয় সওদাগরগণ জাহাজ ভর্তি করে দেশীয় দ্রব্য সম্ভার নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। তারা বিক্রি করত বেশী, সৌখিন বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করত খুবই কম। তাই বাণিজ্যে তাদের কোষাগার স্ফীতই হত। কথায় বলে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'।

এই রপ্তানী বাণিজ্যটিকেই ভারত সরকার শুরু থেকেই উপেক্ষা করে গেছে। ফলস্বরূপ বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত মূলত কংগ্রেসী সরকার রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বাণিজ্যকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে, কোষাগার শূন্য করে বিদেশের কাছে ঋণ করে করে দেশকে ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলেছে। প্রতি বছর ঘাটতি বাজেট দেখতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিটি পরিকল্পনার শেষেও আমরা দেখতাম সেই আমদানীর রমরমা অর্থাৎ ঘাটতি।

এবারে দেখা যাক ১৯৫১ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে ভারতের বাণিজ্যে আমদানী, রপ্তানী ও বাণিজ্য ঘাটতি কেমন ছিল —

সারণী দ্রষ্টব্য

প্রদত্ত সারণী থেকে বোঝা যাচ্ছে, রপ্তানীর তুলনায় আমদানী সব সময়ই বেশি করা হয়েছে অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় 'Balance of Trade' (বাণিজ্য ভারসাম্য) সব সময়েই ভারতের প্রতিকূল থেকেছে। এর পরিণামে দেশের ভান্ডার শূন্য হয়েছে আর তার ফলস্বরূপ World Bank, IMF প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের জালে ক্রমশ দেশ জড়িয়ে পড়েছে। রপ্তানী যে বাড়েনি তা কিন্তু নয়, আমদানী ব্যয়ও প্রচন্ড গতিতে বেড়েছে। কারণটা মুদ্রার মূল্যহ্রাস। আগের সংখ্যাতে টাকার দাম ডলারের তুলনায় কীভাবে বছরের পর কমানো হয়েছে তা দেখিয়েছি। টাকার দাম কমালে বাণিজ্য ঘাটতি যে ঠেকানো যাবে না উপরের সারণীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই প্রতিকূল Balance of Trade বা Balance of Payment অবস্থাকে কীভাবে অনুকূল বাণিজ্যে পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ ঘাটতি অর্থনীতিকে কীভাবে উদ্বৃত্ত অর্থনীতিতে পরিবর্তন করা যায় সে ব্যাপারে সফল পদক্ষেপ নিতে একমাত্র দেখা গেছে বাজপেয়ির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারকে। এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ২০০০ সালের ১ এপ্রিল ঘোষণা করে নতুন আমদানী-রপ্তানী পলিসি (EXIM Policy 2000-2001)। এই পলিসিতে কয়েকটি অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন, কান্দলা (Kandla)-তে FTZ (Free Trade Zone) পত্তনের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন কেন্দ্রে EPZ (Export Processing Zones) গঠন করা হবে। এইগুলি পরিচালনার জন্য নেওয়া হয় নতুন নতুন পদ্ধতি ও উৎসাহ বর্দ্ধক প্যাকেজ (Incentive Packages)। আরও নানান কার্যকরী প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জায়গা এটা নয়। শুধু এই Exim Policy'র ফল কি হল তাই নিয়েই আমি আলোচনা করব। সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখব বিজেপি সরকার চলে যাওয়ার পর UPA সরকারের আমলে বাণিজ্যের হাল কি দাঁড়াল।

সারণী -১

	রপ্তানী	আমদানী	ঘাটতি
প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	৩০২৭	৩৬৭৬	৬৪৯
দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	৩০২৯	৪৮৬৫	১৮৩৬
তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)	৩৭৬৪	৬২০২	২৪৩৮
চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)	৯০৫০	৯৮৬৩	৮১৩
পঞ্চ ম পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯)	২৩৬৪১	২৭৬৮৯	৪০৪৮
ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	৪৪৮৩৫	৭৩৪১৫	২৮৫৮০
সপ্তম পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)	৮৬৯১১	১২৫৫৬১	৩৮৬৫০
অষ্টম পরিকল্পনা (১৯৯২-৯৭)	৪৩১২৮৩	৪৮৮০৪৫	৫৬৭৬২
নবম পরিকল্পনা (১৯৯৭-৯৮)	১৩০১০০	১৫৪১৭৬	২৪০৭৬
নবম পরিকল্পনা (১৯৯৮-৯৯)	১৩৯৭৫২	১৭৮৩৩২	৩৮৫৮০
নবম পরিকল্পনা (১৯৯৯-০০)	১৫৯৫৬১	২১৫২৩৬	৫৫৬৭৫

১৯৯৯ সালে ক্ষমতায় এসেই প্রথম ৯ মাসের মধ্যেই আগের দু'বছরের রপ্তানীর হারকে ছাড়িয়ে যায় প্রায় ১৫ শতাংশ। ২০০২-০৩ অর্থ বর্ষ থেকেই দেশের মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে রপ্তানীর অবদান ক্রমশই বাড়তে থাকে। শুরু হয় ১০ শতাংশ অগ্রগতি ধরে এগোনো। ২০০৩-০৪ থেকেই এটা পৌঁছে যায় ২৫ শতাংশে। এন ডি এ ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত এই হার ১০ শতাংশের অনেক নীচে ছিল। মোট উৎপাদন (GDP) ছিল ৬ শতাংশেরও নীচে। ২০০৩ সালে ডিসেম্বরের শেষে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল পৌঁছে গিয়েছে ১০ হাজার ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারে। আর ওই ক্যালেন্ডার বর্ষে ভারত ৫০০ কোটি ডলারের বৈদেশিক ঋণ আগাম পরিশোধ করেছে। ৫৫০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে রিসার্জেন্ট ইণ্ডিয়া বন্ডের লগ্নিকারীদের পাওনা মেটানোর জন্য। উপরন্তু IMF-কে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে ৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। তা সত্ত্বেও যে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল — এই ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে তা নিঃসন্দেহে ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ারই প্রমাণ। ২০০৩ সালের ২৮ মার্চের পর থেকে ২৪০০ কোটি ডলার ভারতের কোষাগার স্ফীত করেছে। এসব তথ্য কিন্তু বিজেপি'র কোনও নেতার দেওয়া নয়। এসব তথ্য দিয়েছেন স্বয়ং তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ওয়াই ভি রেড্ডি। এইসব তথ্যের মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার যে NDA সরকার চেয়েছিল ভারতের অর্থনীতি হোক আত্মনির্ভরশীল। তাই ২২টি ঋণদানকারী ধনী দেশকে সরাসরি বলেছিল যে ভারতের আর ঋণ দরকার নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা কংগ্রেস চালিত UPA সরকার বামপন্থীদের সাহায্যে ভারতের অর্থনীতিকে লুটেপুটে খেয়ে আবার ভিখারী অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। এবার UPA সরকারের আমদানী, রপ্তানী, রাজস্ব সংগ্রহ, শিল্প-কৃষির হাল হকিকত নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

NDA সরকারের রেখে যাওয়া বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার দেখে মনমোহন সিং সরকার নিয়োজিত প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া এতটাই প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ক্ষমতা হাতে পেয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এই টাকা পরিকাঠামো শিল্পে নিযুক্ত কোম্পানীগুলোকে ঋণ হিসেবে বিলোবেন। ২০০৫ সালের শুরুতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার ফলস্বরূপ নভেম্বর ২১ তারিখে শেষ হওয়া সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার নেমে দাঁড়ায় ২৪৫.৮ বিলিয়ন ডলারে। এমনটি কেন হল? শুরুতেই বলেছি— বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। জিনিস বিক্রি করলে টাকা আসে আর জিনিস কিনলে টাকা চলে যায়। এটাই সহজ অর্থনীতি। কংগ্রেস সরকার বিদেশে যত জিনিস বিক্রি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী কিনেছে। তাই কোষাগারের অর্থ চলে গেছে। একে বলে বাণিজ্য ঘাটতি। এই বাণিজ্য ঘাটতি ২০০০-০১-এ ছিল ২৭,৩০২ কোটি টাকা। ২০-০৭-০৮ এ এই ঘাটতি দাঁড়ায় ৮০.৩০ বিলিয়ন ডলারে। কিন্তু ২০-০৮-০৯-এ অক্টোবরের মধ্যেই এই ঘাটতি পৌঁছে গেছে ১২১ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ বিদেশে যত রপ্তানী করেছে তার চেয়ে ১২১ বিলিয়ন ডলার বেশী আমদানী করেছে।

আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য কমে যাওয়ার পিছনে প্রধান কারণ লুকিয়ে আছে UPA সরকারের অর্থনীতিতেই। প্রতি বছর বাজেট সমীক্ষায় বলেছি, যেভাবে সরকার প্রতি বছর আমদানী শুল্ক কমিয়ে চলেছে আর রপ্তানী শুল্ক বাড়িয়ে চলেছে তাতে ভারতীয় শিল্পে অচিরেই মন্দা আসবে। আজ সেটাই ঘটেছে। সস্তা আমদানীকৃত বিদেশী দ্রব্যে দেশের বাজার ছেয়ে গেছে। নিজের দেশেই দেশীয় দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে না। অন্য দিকে রপ্তানী শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ায় বিদেশের বাজারেও আমাদের জিনিস বিক্রি হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ, চীনে আমরা যত জিনিস বিক্রি করেছি তার চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী জিনিস আমরা চীন থেকে কিনেছি। রপ্তানী করেছি ১১ বিলিয়ন ডলার আর আমদানী করেছি ২৯ বিলিয়ন ডলার।

(এরপর ১৫ পাতায়)

আক্রমণ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না ঃ ওলমার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জল, স্থল, আকাশ — তিন দিক থেকে পর্যুদস্ত গাজা স্ট্রিপ। ইজরায়েল তার সর্বশক্তি নিয়ে নেমেছে এবারের যুদ্ধে। ৩ জানুয়ারিতে গাজা উপকূলে ইজরায়েলের আক্রমণ এবং ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন দ্বন্দ্ব এই দশকের সবথেকে বড় ঘটনা। ইজরায়েলী ট্যাঙ্ক ও সেনা একের পর এক মেশিনগান থেকে গোলাগুলি চালিয়ে মোটামুটি ভাবে গাজা স্ট্রিপকে দু'ভাগে ভেঙে দিয়েছে। যদিও ইজরায়েল সন্দেহভাজন জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ করতে গিয়ে সাধারণ প্যালেস্টানীয়দের রক্তস্রোতও বইয়েছে। অন্যদিকে ইজরায়েলী যুদ্ধ বিমান আকাশ পথে টার্গেট করতেই হামাস জঙ্গিরা মর্টার ও রকেট থেকে গুলি ছুঁড়ে তাদের কাউন্টার অ্যাটাক করেছে। হামাসদের রকেট অবশ্য আক্রমণ করেছে দক্ষিণ ইজরায়েল পর্যন্ত, যা কিছুটা হলেও ইন্ধন জুগিয়েছে ইজরায়েলকে। ইজরায়েলের সরাসরি গাজা'র বসতি এলাকায় আক্রমণের ফলে — স্বাস্থ্য দপ্তরগুলি এরকম তথ্যই দিয়েছে। মৃত্যু সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক। ইজরায়েল বলেছে হামাসের আক্রমণে তাদের একজন সৈনিক নিহত এবং আহতের সংখ্যা ৩২। ইজরায়েল-এর সরকারি সূত্রগুলি থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য গাজায় জঙ্গিদের রকেট-লাঞ্চিং পরিকাঠামোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, তাই আক্রমণ বেশ কিছুদিন ধরে চলতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ইহুদ ওলমার্ট বলেছেন, 'আমাদের সরকার এই শেষ অস্ত্র প্রয়োগের আগে অনেক উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পরিণতি হিসেবে এইরকম আক্রমণ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।'

বিদেশী সাংবাদিকদের গাজাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও প্রতক্ষ্যদর্শীদের কাছ থেকে জানা গেছে, ইজরায়েলী সেনা শুধু গাজা সিটিতেই সন্দেহভাজন জায়গাগুলোকে তাদের দখলে এনেছে। ইজরায়েলের যুদ্ধ বিমান ডজনেরও বেশি টার্গেট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, যেগুলোর মধ্যে গাজার অস্ত্র চোরাচালানের টানেল, অস্ত্রাগার এবং বেশকিছু মর্টার স্কোয়াডও আছে। ইজরায়েল তার সমস্ত সেনা ট্রুপ নিয়ে মোটামুটিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাজার উপর। ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া খবরে মৃত্যুসংখ্যা ৫৩০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে গাজার স্থানীয় পরিবার এবং রিফিউজি ক্যাম্পেরও অনেক লোকজন আছে। ইজরায়েলের বিমান আক্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হলে তারা গাজায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি স্কুলে হামলা চালিয়ে ৪২ জনকে হত্যা করে। তাদের কাছে খবর ছিল এই স্কুলে জঙ্গিরা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রী অবশ্য বলেন, তিনি এই খবর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু একটা জানেন না। তবে এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে হামাস জঙ্গিরা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকছে। তিনি আরও বলেছেন, ইজরায়েল-এর সাধারণ নাগরিকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে নজর রাখছে। হামাস নেতা মাহমুদ জাহার হামাস বাহিনীকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। 'ওরা (ইজরায়েল) যখন আমাদের মসজিদগুলোতে আঘাত করছে তখন সুযোগ করে দিচ্ছে আমরাও যাতে ওদের উপাসনাস্থলে আক্রমণ করতে পারি। যখন স্কুলগুলোতে আক্রমণ চালাচ্ছে তখন আমাদেরও প্রতিশোধ নেওয়ার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে' — বলেছেন জাহার।

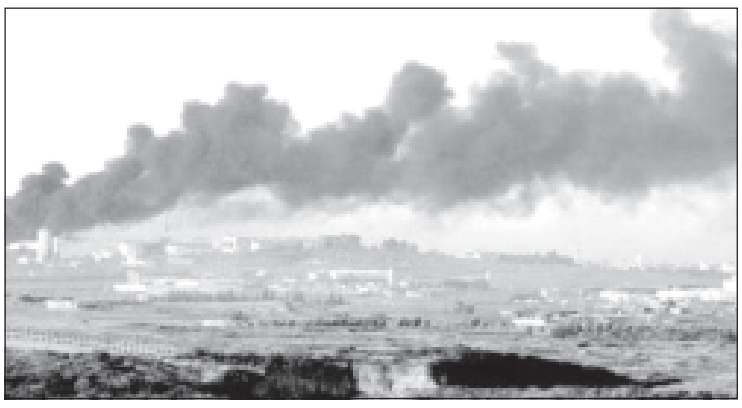

গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলী হানায় ধোঁয়ায় আকাশ ভরে গেছে।

ইহুদ ওলমার্ট

পশ্চিম এশিয়াতে ভূমধ্যসাগরীয় চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গাজা উপকূল যার উত্তর ও পূর্বে আছে ইজরায়েল এবং দক্ষিণে মিশর। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা এই গাজা স্ট্রিপ এখনও পর্যন্ত খুব কম সময়ই শান্ত ছিল। তারপর গাজা হল বৃটিশ শাসিত প্যালেস্টাইনের অংশ। ওদিকে ১৯৪৮-এ ইজরায়েল গাজাকে স্বাধীন ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ হাতছাড়া না করে মিশর তার দলবল নিয়ে হানা দিল গাজা স্ট্রিপে। মিশর সুযোগ নিল ১৯৪৮-এর আরব-ইজরায়েল যুদ্ধেরও।" ৪৯-এ মিশর ও ইজরায়েল এক মীমাংসাতে এল, যদিও গাজা থাকল মিশরের দখলেই। ওদিকে ঠিক ১৯৬৭-তে ইজরায়েল ঝোপ বুঝে কোপ মারে এবং গাজাকে নিজেদের দখলে আনে এবং তখন থেকে একেবারে ১৯৯৪ পর্যন্ত সাজা ছিল তাদেরই শাসনাধীনে। ১৯৯৩-এ অবশ্য প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েল দুই দেশের প্রতিনিধিরাই নরওয়ের ওসলোতে একটি চুক্তি করেন। যদিও সেই চুক্তি কেউ মানার আগেই ইয়াসের আরাফাত-এর প্যালেস্টাইন ইজরায়েলকে বাধ্য করে '৯৪ এ গাজা ছেড়ে চলে যেতে। '৯৪-এর রামাল্লার ইয়াসের আরাফাত বা ২০০৯-এর মাহমুদ জাহার কিন্তু ইহুদী প্রতিবেশীদের তটস্থ করে রেখেছে। যার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এই মারাত্মক আক্রমণ বলে কেউ কেউ মনে করছেন। প্রথমত, 'ওল্ড টেস্টামেন্ট ফলোয়ার্স' ইজরায়েলীদের লক্ষ্য অবশ্যই গাজা স্ট্রিপে-র অন্তর্ভুক্ত জেরুজালেম-এর মাটি। কিন্তু কোনওভাবেই প্যালেস্টাইন জেরুজালেম থেকে তাদের অধিকার হাতছাড়া করবে না, প্রয়োজনে ইজরায়েলের গাজাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ও তারা করে দেয়। কাকতালীয় ব্যাপার, ইহুদীদের পাঠানো খাদ্য ও জ্বালানী ছাড়া প্যালেস্টানীয়দের দিনযাপন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বিশ্বে দাদাগিরি করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ইজরায়েল-এর পাশেই আছে, এমনকী তারা এর শেষ চাইছেন — প্রয়োজনে এক অগ্নিগর্ভ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাতে একটা final destination-এ পৌঁছানো যায়। এ বিষয়ে একটু ভাবলেই বোঝা যাবে আমেরিকার নজর অবশ্যই ইজরায়েলের সাথে সাথে গাজা থেকে ৩২ কিমি দূরের উপকূলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস। কে জানে হয়তো এতে এক প্রকার সাপে বর ! কারণ গোটা বিশ্ব জুড়ে মুম্বাই কান্ডের মত জঙ্গি আক্রমণ যে প্যালেস্টাইন গোষ্ঠীর ইন্ধন পাচ্ছে না, একথা জোর গলায় বলা যাবে না। অন্যদিকে ওবামা কিন্তু মুম্বাই ঘটনার নিন্দায় বুশের সাথে গলা মেলালেও এখন তিনি নিশ্চুপ! তবে তিনি কাকে সমর্থন করছেন? ইজারায়েল ও প্যালেস্টাইন-এর মধ্যে যুদ্ধ বিরতি অবশ্যই কাম্য তবে চিরস্থায়ী কোন সমাধানের মুখ যেন দেখা যায়!

আবহাওয়া

আন্তর্জাতিক

বজরং ক্লাবে আক্রমণ

(১ পাতার পর)

গুন্ডারা। বিনা প্ররোচনায়। করসেবকদের অপরাধ তারা অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে শ্রমদান করে ফিরছিলেন। এই অপরাধে তাঁদের পুড়িয়ে মারা হয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় গুজরাতের কয়েকটি জেলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। সারা গুজরাত জুড়ে দাঙ্গা হয়েছে সংবাদমাধ্যমের এমন দাবি মিথ্যা। গোধরার ঘটনা লঘু করে দেখাতে কলকাতার সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল যে গোধরা স্টেশনে কিছু করসেবক মুসলিম চা বিক্রেতার চা পান করে দাম না দেওয়ায় যে বচসা হয় তার থেকেই হাঙ্গামা ছড়ায়। এই রাজ্যের কয়েকজন নামি দামি সাংবাদিক সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদনে লেখেন যে করসেবকরা ট্রেনের কামরায় স্টোভ জ্বালিয়ে চা জলখাবার তৈরি করার সময় কামরায় আগুন লাগে। এমন অনেক গপ্‌পো তখন আমাদের রাজ্যের সেকুলার সাংবাদিকরা প্রতিবেদনে চালিয়েছেন। একবারও ভাবেননি যে তাঁদের কাল্পনিক প্রতিবেদন জাতিদাঙ্গায় ইন্ধন যোগাতে পারে।

মেদিনীপুর শহরে মহরমের মিছিলকে কেন্দ্র করে ঠিক কী ঘটেছিল সংবাদপত্রের রিপোর্টে তা স্পষ্ট নয়। ব্যক্তিগতভাবে কলকাতা থেকে টেলিফোনে শহরের পরিচিত জনদের কাছ থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি তা এইরকম। মহরমের দু'দিন আগে ৬ জানুয়ারি রাত্রে শহরের মিঞা বাজার থেকে তাজিয়া নিয়ে একটি সশস্ত্র মিছিল হবিবপুর যাচ্ছিল। পথে খাপ্রোলবাজার এলাকায় মিছিলকারীদের কেউ কেউ তাদের হাতের জ্বলন্ত মশাল সেখানে বজরঙ্গ দলের ক্লাব বাড়িতে ছুঁড়ে দেয়। এরই পরিণতিতে বজরঙ্গ ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে মিছিলকারিদের বচসা ও হাতাহাতি হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে মিটমাটও হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে (৮ জানুয়ারি) শহরের গোলকুয়া এলাকা থেকে তাজিয়া নিয়ে বড় একটি মিছিল খাপ্রোল বাজারে বজরঙ্গ ক্লাবভবনে সশস্ত্র হামলা চালায়। গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে বজরঙ্গ ক্লাবের সদস্যরা তাজিয়া আটক করেছে। গুজব শুনে গোলকুয়ায় জমায়েত হওয়া কয়েক হাজার মুসলিম অস্ত্রশস্ত্র সহ খাপ্রোল বাজার ছুটে আসে। দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। শহরের মিঞা বাজার, নিমতলা চক, বটতলা চক, পঞ্চু চক, নান্নুর চক এলাকায় অবাধে লুঠতরাজ চলে। বটতলায় দোকান বাজারে লুঠপাট করার সময় স্থানীয় হরিজন পল্লীর যুবকরা বাধা দেয়। এখানেই লুঠপাটে যুক্ত দুষ্কৃতীরা দুটি মোটরবাইক পুড়িয়ে দেয়। একই ধরনের অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে পঞ্চু চকে। সেখানে একটি হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুর লুঠতরাজ চালানো হয় কেরানীতলা চৌরাস্তায়।

এতটা ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হঠাৎ হয় না। এর পিছনে পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। কোনও প্ররোচনা ছাড়াই বজরঙ্গ ক্লাব ভবনে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এটি অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত। সম্ভবত জেলা প্রশাসনের কাছেও খবর ছিল। কিন্তু সময় মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর কলকাতার সাংবাদিকরা সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য লেখেন না। ভাল কথা, কিন্তু দাঙ্গা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসন পুলিশ ব্যর্থ হলে তার জবাব সাংবাদিকরা কেন চাইবেন না?

উত্তাল ভবানীচক

(১ পাতার পর)

তাই নয়, কোনও দাঙ্গাকারীই গ্রেপ্তার হয়নি। এ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন মূল সমস্যা অর্থাৎ অবৈধভাবে নির্মিত আস্তানা না সরিয়ে স্থানীয় বিধায়ক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রচেষ্টা চালালেও তাতে জাতীয় সুরক্ষা সমিতি ও স্থানীয় হিন্দু সমাজ-এর ক্ষোভ নিরসন হয়নি। ফলে জনসাধারণ এই প্রচেষ্টা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছেন। ২ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ভবানীচক বাজার বন্ধ আছে। ব্যবসায়ী সমিতির দাবি করেছে, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও অবৈধ নির্মাণ অপসারণ না করা পর্যন্ত বাজার বন্ধ অব্যাহত থাকবে।

শহরে হাত তুলে যাতায়াত

(১ পাতার পর)

মেদিনীপুর ব্যাবসায়ী সমিতির সম্পাদক মলয় রায় জানিয়েছেন, পুলিশ সময়মতো হস্তক্ষেপ না করায় অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। রাস্তার মোড়ে যুবকদের বলতে শোনা গেল, মুসলিম মহল্লা ও বস্তি অঞ্চলেই উত্তেজনার রসদ বর্তমান। সিপাইবাজার, পঞ্চু রচক, নিমতলাচক-এর মতো মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক উত্তেজনা ও অস্থিরতা লক্ষ্য করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও আতঙ্ক এখনও রয়ে গেছে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন থেকে বি এম এস-এ যোগদান

সংবাদদাতা ।। গত ১০ জানুয়ারি হুগলী জেলার ডানকুনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার শ্রমিক ইউনিয়নের সহস্রাধিক সদস্যসহ শ্রমিক নেতা আলি আফজল চাঁদ এক প্রকাশ্য সভায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘে যোগদান করেন। এরা সবাই আগে আই এন টি ইউ সি-তে ছিলেন।

এই উপলক্ষে বিশাল জনসভা (কর্মীসভা) অনুষ্ঠিত হয় ডানকুনি রেলগেট বাসস্ট্যান্ডে। উক্ত সভায় যোগদানকারী সকল সদস্য-সদস্যাদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বি এম এস-এর সহ-সভাপতি শিবপ্রসাদ সিং, দিলীপ পাল, উমেশ চৌধুরী, হুগলী জেলা সম্পাদক হরিদাস দত্তগুপ্ত প্রমুখ। সভায় সভাপতি ছিলেন সুব্রত মিশ্র (সম্পাদক, কোল ইন্ডিয়া অফিস কর্মচারী সঙ্ঘ) প্রধান বক্তা অমর কৃষ্ণ ভদ্র, সংগঠন সম্পাদক (পঃবঃ)।

২৫ জনকে নিয়ে আগামী ৩ বছরের জন্য সমিতি পঠিত হয় এবং সর্ব সমক্ষে তা ঘোষণা করা হয়।

সভাপতি সুব্রত মিশ্র, কার্যকরী সভাপতি এস মান্না, সাধারণ সম্পাদক -আলী আফজল চাঁদ, কোষাধ্যক্ষ-সেখ সওগাত। উল্লেখ্য, ২৫ জনের সমিতিতে ৪ জন মহিলা সদস্যা আছেন। সভাশেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

হজে ভরতুকি

(১ পাতার পর)

কারণ তাঁর মুসলিম তোষণে হিন্দুরা কিছুটা হলেও খেপতে শুরু করেছে। আর তা বুঝেই জেলা পরিষদের মুসলিম সভাধিপতি শামিমা শেখকে দিয়ে তীর্থকর নেওয়ার বিরোধিতা করাচ্ছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনে সিপিএমের টনক নড়েনি। তৃণমূলের আন্দোলনেও সিপিএম এক বগ্গা নীতি নিয়েছে। তা হল তীর্থকর আদায় চলবে। বামপন্থীরা যে কতটা হিন্দু বিরোধী এই ঘটনা তা প্রমাণ করছে।

রাজ্য রাজনীতি

নন্দীগ্রামে সি পি এমের নীতি ও নেতৃত্ব পর্যুদস্ত

নিশাকর সোম

সাবাস নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের মানুষ হত্যা-ধর্ষণ-পুড়িয়ে মারা-গুলি-গৃহদাহ-খুন-জখম-রাহাজানি — এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুলেট নয়, ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ-প্রতিশোধ নিলেন। এটি কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের জয় বললে জনগণের ভূমিকাকে ছোট করে দেখানো হবে। ভুলে গেলে চলবে না, শাসকদের বন্দুকের গুলি অত্যাচার স্তব্ধ হয়ে যায় মরণ জয়ী মানুষের দৃঢ়তায়। বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম-বিনয়-মদন তথা সিপিএম-এর নীতি ও নেতৃত্ব পর্যুদস্ত হয়েছে। আরও হবে। বিমান বসু নাকে কাঁদুনি গেয়ে বলেছেন, নন্দীগ্রামে চাপা সন্ত্রাস ছিল। বিমানবাবু, যদি তাই হয়ে থাকে তবে সেটা আপনাদেরই শেখানো কায়দা আজ বুমেরাং হয়েছে। আগামী দিনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামের মতো মানুষ তাঁদের রায় দেবেনই। এখন চাই শুধু ১ঃ১ প্রার্থী। তবেই বিধানসভা থেকে সিপিএম অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

স্বার্থপর-ধান্দাবাজ-গোষ্ঠীপতি নেতা মন্ত্রীদের হঠানোর অভিযানে জনগণকে দৃঢ় পদক্ষেপ ফেলতে হবে। ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিরোধী শক্তি যদি জনগণের কাছে যেতে পারে তবে সিপিএম-এর শ্মশান শয্যা ত্বরান্বিত হবে। যে 'পাড়া' কেন্দ্রে সিপিএম জিতেছে এবং যার দায়িত্বে ছিলেন রবীন দেব, সেখানেও সিপিএম-এর বিরুদ্ধে ৩০ হাজার মানুষ রায় দিয়ে দেয়। যদি বিরোধীদল এক হয়ে সেখানে প্রচারে থাকতেন, তা হলে এই কেন্দ্র থেকেও সিপিএম বিতাড়িত হতো। তাই বিরোধীদের ঐক্য চাই — ঐক্য ছাড়া অন্য পথ নাই। এবং এজন্য দলীয় স্বার্থ, দলীয় অহঙ্কার ত্যাগ করুন বিরোধী নেতা-নেত্রীরা। প্রসঙ্গত প্রতিটি কেন্দ্রে সিপিএম-এর কর্মী সমর্থকদের একাংশ সিপিএম তথা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন।

মেদিনীপুরে একটি লোকসভার সিটেও বামফ্রন্ট জিতবে না। নন্দীগ্রাম জানিয়ে দিল — অত্যাচারী লক্ষ্মণ শেঠের পরাজয় অনিবার্য। অহঙ্কারের অভ্রংলেহি মালা ফেলতে হবে পথের ধুলায়।

বুদ্ধ

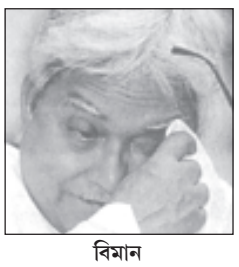

বিমান

বুদ্ধ দেবের শিল্পায়নের নামে অত্যাচারী নীতির পরাজয় নিশ্চয়ই সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের ভাবাবে। আওয়াজ উঠুক — সিপিএম হঠাও পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও। এরাজ্যে সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রকট হয়ে উঠছে। এ সরকারের বিদায় ঘন্টা বাজতে শুরু করতে চলেছে। এখন প্রশ্ন, সেই ঘন্টাটি বেড়ালের গলায় বাঁধবে কে?

অটো নিয়ে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়েছে। যানবাহনে আগুন লাগানোর কাজে অটো চালকরা পিছ্পাও হননি। অটো-চালকদের এই আন্দোলনে (?) তৃণমূল পরিচালিত ইউনিয়ন এবং সিপিএম পরিচালিত ইউনিয়ন একত্রে করছে। অটোর এই সমস্যা একদিনের নয়। বহু পুরানো। এই অটোচালকদের সিপিএম সরকার তথা সিটু আস্কারা দিয়ে চলেছিল। প্রথমে ঠিক ছিল অটোতে মিটার লাগানোর কথা। তদনুযায়ী কিছু অটোতে মিটার লাগানো ছিল। তারপর মিটার খুলে দিয়েই অটো চালানো হচ্ছে। তৎকালীন পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী এবং সরকার নীরব সমর্থন জানান অটোচালকদের। কিছু বলা হল না, কারণ অটোচালকরা ভোট-নদী পারাপারের কান্ডারী। যে বীজ সেদিন রোপন করা হল, তা আজ মহীরূহ-তে পরিণত হয়েছে। এখন ব্যুমেরাং হচ্ছে। বর্তমান কীর্তিমান পরিবহন মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছেন, ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে অটো সমস্যার ক্ষেত্রে 'গো-স্লো' নীতি নেওয়া হচ্ছে। তাতেও কিছু ফল হবে না। এই অটোচালকরা তৃণমূলের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনে থাকার দরুণ আজ সম্পূর্ণ ভাবে সি পি এম বিরোধী হয়ে উঠেছেন।

জয়ী ফিরোজা বিবির হাত ধরে তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই অটোচালকগণ যাত্রীদের সঙ্গে প্রায়ই দুর্ব্যবহার করে থাকেন। রাস্তা জ্যাম হলেই ভাড়া দ্বিগুণ / তিনগুণ করে দেয়। সমর্থন দেয় সিটু ইউনিয়ন। জনস্বাস্থ্য-পরিবেশ দূষণ কোনও বিষয়েই আগে থাকতে ভাবা হয়নি। আসলে ক্ষমতার অহঙ্কারের মদমত্ততায় জনসাধারণ-কে মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয় না। সিপিএম যেন মনে রাখে নির্বাচনে স্লোগান উঠবে — "অটোচালকদের বাঁচাও, সিপিএম হঠাও।"

আর একটি বিস্ফোরক ঘটনা ঘটেছে — বিষ মদে প্রায় অর্ধশত ব্যক্তির মৃত্যু। অর্থ তথা আবগারি মন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত বলেছেন, বিষ মদের শেকড় উপড়ে ফেলবো। এটাও জানা কথা, অসীম দাশগুপ্তের নির্বাচনী এলাকাতেই সব থেকে বেশি চোলাই মদের বে-আইনি কারখানা। মদের ঠেক ভাঙার বিরুদ্ধেই সিপিএম। কারণ এখান থেকে মাল-পানি পাওয়া যায়। এছাড়া একটা জাতিকে যদি অচেতন করে দিতে হয় তবে এই মাদক দ্রব্যের অবাধ ব্যবস্থা করা দরকার — এটা সিপিএম সরকারের নীতি। এই কারণেই দেশি মদের দোকানের লাইসেন্স ব্যাপকভাবে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। যুব সমাজকে সরকার বিরোধী আন্দোলন থেকে সরিয়ে রেখে নির্বীর্য করার জন্য মাদক সেবনের অবাধ ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, অন-লাইন জুয়াও অবাধে চলছে। তাতে বহু সংসার ধবংস হয়ে যাচ্ছে। কলকাতার অলিতে-গলিতে অন-লাইন জুয়া চলছে।

আরও আছে। নীল ছবির প্রদর্শনী তো অবাধ হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে এই ব্লু-ফিল্‌মের রমরমা।

এইভাবেই এই প্রজন্মের যুব সম্প্রদায়কে কলুষিত, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন করে সিপিএম পার্টির স্বার্থ সিদ্ধি করার এক পঙ্কিল পথ অনুসরণ করে চলেছে। মদ-যৌন-জুয়া — এই তিনটি সর্বনাশের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার জগতেও পার্টির স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ ঘরের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সাফল্য লাভ করতে পারছেন না। তাই যুব সম্প্রদায়ের উত্থান একান্ত দরকার।

অন্য রকম

রত্নাকর

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কয়েক বছরের ব্যবধানে তার পুরো লাইফ স্টাইলটাই বদলে গেছে। সে নিজেও কোনওদিন ভাবেনি তার জীবনে এমন পরিবর্তন আসবে। পাড়া-পড়শি থেকে নিজের আত্মীয়-স্বজন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি টেকা মাঝি এভাবে পাল্টে যাবে। কুখ্যাত আসামি থেকে একেবারে সমাজসেবী। সমাজদ্রোহী থেকে সমাজমুখী। সে নিজেও একথা ভাবলে অবাক হয়। এসবই সম্ভব হয়েছে শিক্ষার গুণে। শিক্ষা যে চেতনা আনে টেকা মাঝি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এ যেন রত্নাকর থেকে বাল্মীকিতে রূপান্তরের মতো।

শিশুদের মধ্যে বই-খাতা বিতরণ করছে টেকা।

বছর পাঁচেক আগেও টেকা মাঝির পরিচয় ছিল সে কুখ্যাত মাফিয়া। এমন কোনও কুকীর্তি ছিল না, যাতে সে হাত দেয়নি। বিহারের ভাগলপুর থেকে ৯০-১০০ কিমি দূরের মুসুরি গ্রামের টেকা মাঝি শোলের গববর-এর মতোই কুখ্যাত গুন্ডা এবং সেই হিসাবে তারও দূর-দূরান্তে নাম-ডাক ছিল। প্রকাশ্যে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ানো থেকে জেল ভেঙ্গে পালিয়ে যাওয়া — সবেতেই ওস্তাদ ছিল টেকা। তাকে ধরার জন্য পুলিশ-প্রশাসনের রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। গঠন করা হয়েছিল বিশেষ টাস্ক ফোর্স। এখনও তার নামে ১২০টি কেস-ফাইল থানায় পড়ে আছে।

এসবই এখন অতীত। টেকা মাঝির পরিচয় পাল্টে গেছে। এখন তার পরিচয় টেকা দস্যু থেকে সমাজসেবী টেকা মাঝি। গ্রামের ক্লাসটার রিসোর্স সেন্টার (সি আর সি)-এর সান্নিধ্যে এসে, আজ টেকার হাতে বন্দুক, রিভলবারের জায়গায় পেন-খাতা ঠাঁই পেয়েছে। বন্দুকের থেকে কলমের জোর যে বেশি টেকা তা অনুভব করছে। এখন তার পাশে দুস্কৃতীদের ভিড় নেই। কচি-কাঁচাদের নিয়েই সময় কাটায় টেকা। তাদের যাতে লেখা-পড়া ঠিকমতো হয় তারও ব্যবস্থা করে সে। প্রয়োজনে পেন-খাতা, স্লেট-পেনসিল দিয়ে সাহায্য করে। টেকার একমাত্র কন্যা এখন বাবার নামে গর্বিত হয়। সে গর্বের সঙ্গে বলে, টেকা মাঝি আমার বাবা। পাড়ার শিশুরাও টেকাকে ভালোবাসে। তার মুখে চোখে আলতো হাতে হাত বুলিয়ে দেয়। কাকু কাকু করে দৌড়ে আসে। টেকা অনুভব করে প্রকৃত মানুষ হয়ে বাঁচার গুরুত্ব কত। জীবন কত সুখের!

থানার ইতিহাসে টেকা আসামি। কিন্তু জীবন যুদ্ধের ইতিহাসে টেকা মাঝি একজন খাঁটি সৈনিক। সে গববর-এর মতো কুখ্যাত নয়। বাল্মিকীর মতোই মহান। টেকা নিজেও এজন্য গর্বিত।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার ক্ষমতা দখল ও ভারত

বাসুদেব পাল ।। ইংরেজি নববর্ষের শুরুতেই রক্তক্ষরণ হল অসমের প্রধান শহর গুয়াহাটিতে। পর পর তিনটি বিস্ফোরণে মৃত পাঁচ, আহত ৬০ জনের মতো। স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ করা হচ্ছে বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা অসমে সক্রিয় জঙ্গিগোষ্ঠী উলফা বা ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম-কে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ৩০ অক্টোবরের পর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিস্ফোরণের মূলে রয়েছে শেখ হাসিনার বিবৃতি। গত ২৯ তারিখ-এর সাধারণ নির্বাচনে জিতেই হাসিনা ভারতকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা চাপে পড়ে তাঁর একটা অপ্রিয় বিবৃতি — "বাংলাদেশের মাটিকে প্রতিবেশী দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।"

অসমের শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন উলফা'র বাংলাদেশে অনেক প্রশিক্ষণ শিবির, নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং ব্যবসায়িক স্বার্থও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। উলফার শীর্ষ নেতা কমান্ডার ইন্ চিফ্ পরেশ বরুয়া এবং সভাপতি অরবিন্দ রাজখোয়া প্রায় দু'দশক ধরে বাংলাদেশে রাজার হালে জীবনযাপন করছেন। বহুল প্রচারিত খবর হল, উলফা বাংলাদেশে ভালো পরিমাণ অর্থ লগ্নীও করেছে। নতুন দিল্লীর মানসিক সন্তোষ যে, পাক সমর্থক খালেদা জিয়ার চার দলীয় ইসলামি ঐক্যজোট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লীগ ও বহুদলীয় ঐক্য — 'মহাজোট'-এর হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছে। আওয়ামি লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ৩০০ সদস্যের বাংলাদেশ সংসদে ২৬১টি আসনে জিতেছে। সেখানে খালেদার ইসলামি জোট মাত্র ৩১টি আসনে জিতেছে।

ইতিমধ্যে গত ৬ জানুয়ারি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেছেন। স্বভাবতই ভারত প্রতিবেশী বাংলাদেশের নতুন শাসকদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদসহ অনেক দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে দ্রুত কথাবার্তা ও সমাধানে আগ্রহী। বন্ধুভাবাপন্ন বর্তমান বাংলাদেশ সরকার-এর সহযোগিতায় ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন এবং বাংলাদেশের মাটিতে বহুবিধ ইসলামি উগ্রপন্থীদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্ক্রিয় করতে উদ্যোগী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খালেদা জিয়ার শাসনকালে বাংলাদেশে ভারতে সক্রিয় বেশ কয়েকটি শক্তিশালী উগ্রপন্থী সংগঠন-এর নিশ্চি ন্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থল গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে উলফা ছাড়াও এন এল এফ টি (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ ত্রিপুরা), এ টি টি এফ (অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স), হাইনট্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল (মণিপুরী জঙ্গি গোষ্ঠী), কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এল ও- উত্তরবঙ্গে সক্রিয়), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বোড়োল্যান্ড (এন ডি এফ বি) প্রমুখ রয়েছে। এছাড়াও চরম বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল ইসলামি টেররিস্ট সংগঠনগুলিরও। তাদের মধ্যে — হরকত উল জিহাদ-ই-ইসলামি ('হুজি') খালেদার আমলে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর এ তৈবার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে ২০০৪ থেকে ডাল-পালা বিস্তার করে

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করছেন হাসিনা।

গজিয়ে উঠেছিল। এছাড়া স্থানীয়ভাবে অনেক বাঙালি যুবকদের নিয়ে নতুন নতুন ইসলামি জঙ্গি সংগঠনও দাঁড় করিয়েছিল যৌথভাবে লস্কর, জৈশ এ মহম্মদ এবং আই এস আই। ওইসব সংগঠনের মদতে বাংলাদেশ থেকে তারা ভারতে ঢুকে পশ্চি মবঙ্গের লাগোয়া মালদা, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় স্টু ডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া বা সিমি-কে মদত দিত। আর এর ফলে সিমি ভারতে ভালোমতো সাংগঠনিক জাল বিস্তার করতে পেরেছে। যদিও সিমি এখন ভারতে নিষিদ্ধ রয়েছে। ১২ অক্টোবর, ২০০৫ থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী শহরে একের পর এক আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। হায়দরাবাদ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স প্রত্যেকটি ঘটনায় হুজি জঙ্গিদের জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে। গত বছরের ২৪ আগস্ট ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর অফিসারদের হাতে ২৬৩জন ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীর তালিকা এবং ১১০টি উগ্রপন্থী শিবিরের তালিকা তুলে দিয়েছিল।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনার পুনরায় মসনদে আসীন হওয়াটা ভারতের পক্ষে কিছুটা হলেও আশার সঞ্চ ার করেছে। সম্ভবত, ঢাকা এবার হয়ত উলফা বা হুজি জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। তবে প্রশ্ন উঠছে বাংলাদেশ সন্ত্রাস প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেবে কিনা! শেখ হাসিনার এই বিপুল জয়লাভ ভারতকেন্দ্রিক অবস্থান নেওয়ার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু বাস্তবে সবকিছুকে পাকিস্তানী প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করাটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কেননা মাঝখানে রয়েছে পাকিস্তানী আই এস আই-এর বাংলাদেশী কাউন্টারপার্ট ডি জি এফ আই। তাদের উপস্থিতি ঢাকার নিরাপত্তা বাহিনীর সব স্তরেই রয়েছে। ডি জি এফ আই-ই বাংলাদেশে ভারতবিরোধী জেহাদি গোষ্ঠীগুলোকে সাহায্য, সমর্থন ও সংরক্ষণ প্রদান করে চলেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আগের বার শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন, তখনও উলফা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশে অবাধে বিচরণ করেছে। শুধু নির্বাচনী সাফল্যই টেররিজমকে কাউন্টার করার উপায় হতে পারে না। সবদিক থেকে সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, ভারতে আজ পর্যন্ত সন্ত্রাস মোকাবিলার সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশে বরাবরই ইসলামি উগ্রপন্থী ও মৌলবাদীদের দাপট রয়েছে। সেক্ষেত্রে শেখ হাসিনা কতটা ভারতের স্বার্থরক্ষা করতে পারবেন তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদ এখন আর কোনও বিচ্ছিন্ন নয়, বৈশ্বিক ইসলামি জঙ্গিবাদের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হাসিনার নেতৃত্বে নতুন সরকার-এর পক্ষে ভারতের দাবি কতটা 'মানা' সম্ভব সেটাও ভাববার বিষয়।

কেননা নির্বাচনে হেরে গেলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মৌলবাদী ধর্মীয় সংস্থা, জামাত ও তার সাগরেদরা তো রয়েছেই। রয়েছে জামাত-এ-ইসলামির সশস্ত্র ক্যাডাররাও। ভারতকে এইসব পরিস্থিতি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। ঠিক কী ও কতটা বিপদ সীমান্তের ওপর থেকে ভারতের উপর চেপে বসছে, সেটাও গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে প্যান-ইসলামিজমের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার দিকেও।

সর্বোপরি ভারতকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা পরনির্ভর না হয়ে নিজেকেই লড়তে হবে। বাংলাদেশের সরকারকে বাধ্য করতে হবে নিশ্চি ত সময়সীমার মধ্যে সেদেশে ভারতের উগ্রপন্থীদের শিবিরগুলোকে অকেজো করে দিতে। ঢাকা অস্বীকার করার আগেই এটা করিয়ে নিতে হবে।

কেরলের সি পি এমও মোদির উন্নয়ণে ভয় পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেরলের সিপিএম মহলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশই জটিল হচ্ছে। কন্নুর জেলার তরুণ সাংসদ এ পি আবদুল্লাকুট্টীর মন্তব্যে চরম অস্বস্তিতে পড়েছেরাজ্য নেতৃত্ব। তিনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মোদির উন্নয়ণে পঞ্চ মুখ হওয়ায় এখন পার্টির ভেতরে জল ঘোলা শুরু হয়েছে। গত ২৮ ডিসেম্বর তিনি দুবাই-এ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মোদির প্রশংসা করেন। বলেন, কেরলের ক্ষেত্রেও মোদির উন্নয়নমুখী ভূমিকা মডেল হতে পারে। মোদি ন্যানোর ক্ষেত্রে যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি তা তুলে ধরে বলেন, পশ্চি মবঙ্গ থেকে বিতাড়িত টাটার ন্যানো গুজরাটে তুলে এ নে মোদি তাঁর সফলতার পরিচয় রেখেছেন। কেরলের উন্নয়ণের ক্ষেত্রেও মোদিকে মডেল হিসাবে তুলে ধরায় বেজায় খাপ্পা পার্টি নেতৃত্ব। এদিকে মোদির উন্নয়ণ যে মিথ্যা নয়, তা মিডিয়ার রিপোর্টেও প্রকাশ। ফলে এক কথায় মোদি ভীতিই সিপিএম নেতৃত্বকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। রাজ্য নেতৃত্বেরও কাছেও মোদি ভীতি মাথা

নরেন্দ্র মোদী

এ পি আবদুল্লাকুট্টী

ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিপিএমের এই তরুণ সাংসদের বিবৃতিতে সিপিএম জেলা নেতৃত্বসহ রাজ্য নেতৃত্ব বেকায়দায় পড়লেও, এই নেতার বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি সিপিএম। সিপিএম-এর একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে লম্ফঝম্ফ করলেও, তাঁর নেতৃত্ব-গুণের জন্য দল এখনই কোনও বড় ধরনের ব্যবস্থা নিতে ভয় পাচ্ছে। আবার তাঁর হাতে বড় অংশের মুসলিম ভোট থাকায়, দলকে ভোটব্যাঙ্ক-এর কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। যদিও কন্নুর সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক পি সাই তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেও রাজ্য নেতৃত্বের অন্য কেউ এবিষয়ে মুখ খোলেননি।

এদিকে মিডিয়ার এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সোনিয়া গান্ধী যে মোদিকে 'মউত কা সওদাগর' বলেছিলেন, তিনি এখন মউ স্বাক্ষরের সওদাগর। সমীক্ষায় প্রকাশ, মোদি তাঁর রাজ্যে ব্যবসার জন্য সব থেকে বেশি মউ এখনও পর্যন্ত স্বাক্ষর করেছেন। ২০০৩ সালে তিনি ৭৬টি মউ স্বাক্ষর করেন। ২০০৫-এ ১৫২, এবং ২০০৭-এ ৩৬টি মউ স্বাক্ষর করেছেন। যা শতাংশের হিসাবে ৭৬.২ শতাংশ পর্যন্ত। বড় বড় উদ্যোগপতি ও শিল্পপতিদের কাছেও গুজরাট বিনিয়োগের আদর্শ ক্ষেত্র। তরুণ সিপিএম সাংসদের মন্তব্যের মধ্যেও যে কোনও মিথ্যা নেই তা অনেক বিরোধী দলের নেতাও স্বীকার করেছেন।

সিপিএমের দুর্গে জলঘোলার মাঝেই এ পি আবদুল্লাকুট্টী সম্প্রতি প্রকাশ্যে বলেছেন, তিনি মোদীর বিনিয়োগ প্রীতির কথা বলেছেন এবং একথা বলে তিনি কোনও ভুল করেননি। এরই মাঝে তিনি দলের অন্ধ মুসলিম প্রীতির মতো বিতর্কিত বিষয় নিয়েও মুখ খুলেছেন। তবে এত সবের পরও সিপিএম নেতৃত্ব মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক হাতছাড়া হওয়ার ভয়েই কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছেন না।

উত্তর-পূর্বাঞ্চ লে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রসার ঘটছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নারী জাতির মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণ ও শিক্ষার বিস্তারে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজের প্রসার ক্রমশই বাড়ছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চ লে সমিতির সাংগঠনিক কাজকর্মের প্রসার হচ্ছে বলে জানা গেছে। সেবিকা সমিতির কার্যবাহিকা শান্তা আক্কা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, আমরা সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাজ করে চলেছি। নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি র জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতে আরও একগুচ্ছ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। হাফলং-এ ছাত্রীদের জন্য ইতিপূর্বেই একটি নতুন হোস্টে ল চালু হয়েছে। গুয়াহাটি ও কোকরাঝাড়েও হোস্টে ল চালু করার পরিকল্পনা আছে। এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগপুর, ব্যাঙ্গালোর, নানদেড়, জলন্ধরেও মহিলাদের জন্য হোস্টে ল চালু হতে চলেছে। যা সম্পূর্ণ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি দ্বারা পরিচালিত হবে। এই সমস্ত হোস্টেলে দরিদ্র ও প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা থাকার সুযোগ পাবেন। বর্তমানে বিদেশেও সমিতির ভালো কাজ আছে। ২২টি দেশে সমিতির শাখা রয়েছে। ভারতের সর্ববৃহৎ মহিলা সমিতি হিসাবে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ২২টি স্বনিয়ন্ত্রিত হোস্টে ল রয়েছে। যেখানে মেয়েদের বৌদ্ধি ক, আত্মিক-বিকাশের প্রতি জোর দেওয়া হয়।

বর্তমান সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও তারা কিছু কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এবিষয়ে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারিতে একটি সমাবেশের আয়োজন চলছে। অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশেও আগের থেকে কাজের প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে এই সমস্ত শাখায় ১৩ জন পূর্ণকালীন বাদে আরও ২০০ জনেরও বেশি সেবিকা কাজ করছেন।

পুলিশ কমিশনার গফুরের অসহযোগিতা

মুম্বই হামলার তদন্তে বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রতি এক জার্মান কমান্ডার কৌতুক করে বলেছিলেন — 'সিংহবাহিনী গাধাদের দ্বারা চালিত'। আজ মুম্বাই-এর ২৬/১১-তে আর একবার অক্ষরে অক্ষরে সেই কথাটাই যেন সত্য হয়ে গেল। কারণ, সে সময় যখন মুম্বাই পুলিশের তথাকথিত উচ্চপদস্থরা তাদের লাক্সারী গাড়ির আরামদায়ক চেয়ারে বসেছিলেন, ঠিক তখনই মাঠে নেমে এন এস জি-র জওয়ানরা বুক চিতিয়ে জঙ্গিদের গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করছিল।

আত্মউল্লাস ও আত্ম-অভিবাদনের পর্ব শেষে, মুম্বাই পুলিশের ওপর মহল এখন তাদের দক্ষতা নিয়ে বেশ কতকগুলো অপ্রীতিকর প্রশ্নের মুখোমুখি। মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার হাসান গফুর এবং ডি জি, এ এন রায়-এর বিরুদ্ধে আনা বিরোধী নেতা রামদাস কদম-এর অভিযোগের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এই সমস্ত ঘটনার পিছনে রাজনীতির ওপর মহলের হাত আছে বলে তিনি মনে করছেন। শিবসেনা ও বিজেপি ডি জি এ এন রায়, গফুর ও স্বরাষ্ট্র সচিব চিৎকলা জুৎসি — এই তিনজনের পদত্যাগ দাবি করার পরেই চ্যবন ওই কথা বলেন। ওই তিন জন শুধু শিবসেনার দাবিতেই নয়, সমস্ত স্তরের চোখেই নাকি এই চরম অদক্ষতার জন্য দায়ী। এইসব অভিযোগের আঙুল ছাড়াও, মুম্বাই পুলিশ এককথায় একটা সমন্বয়হীন দপ্তর। অনেকে মনে করতে পারেন, এই অভিযোগের আঙুল হয় তো একটা Wake-up-call হতে পারে মুম্বাই পুলিশ ও তার রক্ষাকারী নেতা-কেতাদের জন্য, কিন্তু অক্ষমতা ও একাধিপত্যের এই আবরণ যতক্ষণ না সরছে; তা দূর অস্ত।

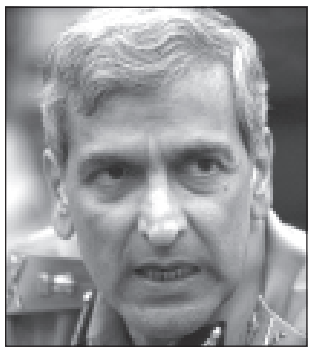

হাসান গফুর

মার্কিন তদন্ত সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন- (FBI)কে গফুরের অসহযোগিতা, (FBI-এর কাজ গফুরের হস্তক্ষেপে অন্তত তিন দিন ঝুলে ছিল) বা এ টি এস-কে অকর্মণ্য রাখা অথবা তাদের অভিযানের সময়কার ঘটনার ফুটেজ লিক করা বলতে গেলে কোনও গাফিলতিই মুম্বাই পুলিশ বাকী রাখেনি। পরে অবশ্য তাদের কাছে বিষয়গুলো জানতে গিয়ে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। কারণ, কমিশনার অথবা ডি জি কেউই কোনও ফোন অথবা ফ্যাক্সের রেসপন্স করেননি। অভিজ্ঞ অফিসাররা মনে করছেন, নেতৃত্বের অভাব এবং পুলিশ বাহিনীর রাজনীতিকরণ এবং বিশেষত কমিশনার ও ডিজির ভিতর চলতে থাকা একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব, যেটা কিনা রায়-এর কমিশনার থাকার সময় খুব বেশি ছিল, এর পিছনে কাজ করছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যার প্রভাব দেখা যাচ্ছে ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাসের হামলা নিয়ে এ টি এসের অনুসন্ধান করা দেখে।

২০০৪ সালের জুলাই-এ শুরু হওয়ার পর থেকে, ২৬/১১ বাদ দিয়ে, মুম্বাইতে হওয়া সমস্ত বিস্ফোরণের তদন্তের কাজে নিযুক্ত ছিল এ টি এস। কিন্তু যখন থেকে এই স্কোয়াড ডি জি-র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত, তখন থেকেই অবস্থা শোচনীয়। প্রাক্তন ডি জি পি বলছেন, 'এই তদন্তের (২৬/১১'এর) ভার এ টি এস-এর হাতেই যাওয়া উচিত ছিল। ২০০০ সাল থেকে মুম্বাই পুলিশ সমস্ত রিপোর্ট ডি জি 'র পরিবর্তে গৃহ মন্ত্রণালয়কে দিচ্ছে। এটা পুলিশবাহিনীর নীতির বাইরে'। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার গৃহ মন্ত্রালয়ও জানাচ্ছে, তারা ছট্টবব্রগ্ন নাকি ক্রাইম ব্রাঞ্চে র থেকে 'কম যোগ্য'।

এ টি এস এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চে র ঝগড়া যত বাড়ছে, নেতারা ততই পার্টিগত রং, জাত

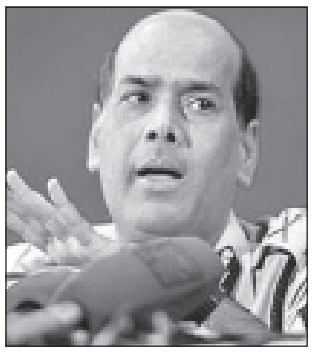

এ এন রায়

আর ধর্মের গেটপাস দিয়ে পুলিশের ভালো পদগুলো ভর্তি করতে চাইছে। অনেক প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এর জন্য নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বকেই দায়ী করছেন। মহারাষ্ট্রে বিজেপি'র সাধারণ সম্পাদক নীতিন গদকারী বলছেন, 'শাসকদল জেলার এস পি পদে তাদের লোক রাখছে কাজ হাসিলের জন্য। আর রাজ্যের ডি জি পি - এ এন রায় কাজ করছেন শরদ পাওয়ারের ইশারায়। তিনি কখনই মুখ্যমন্ত্রী-র কথায় কাজ করেননি।

মূলত জঙ্গিদমনে এই ডি জি বা কমিশনার খুব একটা কাজে আসেনি। মুম্বাই পুলিশের ওপরতলার অফিস এবং ডি জি-র মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বটা ডিজি'র ও গৃহ মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগ, NSG-কে নিযুক্ত করার ঘটনাতেই স্পষ্ট। পুলিশ কর্তাদের নেতৃত্বের অভাব বড় স্পষ্ট, মুম্বাই ঘটনার যখন দু'ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, আরও ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে, গফুর তখন ট্রাইডেন্ট ওবেরয়-এর বাইরে একটি হোণ্ডা সিটি গড়ীতে সশস্ত্র পুলিশের এ সি পি পাওয়ার ও নিরাপত্তা বিভাগের এ সি পি বিনয় কারগাঁওকারের ঘেরাটোপে আরাম করছিলেন। সিনিয়র অফিসাররা আলোচনা পর্যন্ত করেননি। আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন অনুরাগ গ্রোভার বলেন, হোটেলগুলোর বাইরে ও ভিতরে যারা নিযুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব ছিল এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের কাছে টেলিফোনও ছিল না। গোলযোগের সূত্রপাত পুলিশ কন্ট্রোল-রুম থেকেই, তখন এই কন্ট্রোলরুমের দায়িত্বে থাকা জয়েন্ট কমিশনার (অনুশাসন) বি ডি মোরে ব্যস্ত নারিম্যান হাউসে ক্যাম্পিং-এর কাজে। তাকে বারংবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও কিছু বলতে চাননি। তার অনুপস্থিতিতে জে সি পি (ক্রাইম) রাকেশ মারিয়া সেই

(এরপর ১৩ পাতায়)

এবার কেন্দ্রেরও স্বীকৃতি পেল 'সালয়া জুডুম'

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মাওবাদীদের শায়েস্তা করতে ছত্তিশগড় রাজ্য সরকারের প্রবর্তিত 'সালয়া জুডুম'-কে এবার কেন্দ্র সরকারও স্বীকৃতি জানাল। সম্প্রতি মাওবাদী সন্ত্রাসে জর্জরিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে দিল্লীতে দু'দিনব্যাপী আলোচনা ও বৈঠক হয়। সেখানেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম বলেছেন, "গ্রামবাসীদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার-রা উগ্র লালসন্ত্রাস দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই এরকম এস পি ও নিয়োগ করা দরকার।" এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাওবাদীরা জনজাতি বহুল ছত্তিশগড় রাজ্যে নিরীহ জনজাতিদের উপর বেশ কয়েক বছর ধরে জোরজুলুম ও অত্যাচার চালাচ্ছিল। এমনকী হাজার হাজার জনজাতিদের পুলিশী পাহারায় ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। তখন রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং জনজাতিদের দিয়েই তাদের মোকাবিলা করতে 'সালয়া জুডুম' গঠন করেন। রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেসও তা সমর্থন করে। কিন্তু কেন্দ্র সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল সালয়া জুডুম-এর সমালোচনা করেন। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে রমণ সিং সরকার জনজাতিদের মধ্য থেকেই আত্মরক্ষামূলক বাহিনী হিসেবে সশস্ত্র স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিযুক্ত করেন। সাতটি নকশাল উগ্রপন্থা কবলিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রের ডাকে রাজধানীতে ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম তাঁর বক্তৃতায় ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং-এর বক্তব্যকেই উদ্ধৃত করেন। রমণ সিং বলেছিলেন, যে সকল জনজাতিরা মাওবাদী বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত, সরকার তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে। এস পি ও-রা সালয়া জুডুম-এরই অঙ্গ এবং তাদেরকে সরকার সশস্ত্র প্রশিক্ষণও দিয়েছে।

মাওবাদী সন্ত্রাসে প্রভাবিত ও জর্জরিত সাতটি রাজ্য হল — ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। বিগত ২০০৮ সালে মাওবাদী সন্ত্রাসের যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, তার শতকরা ৬৫ ভাগ ঘটনাই ঘটেছে ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ে। সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাই এক 'সুসমন্বদ্ধ অ্যাকশন প্ল্যান' গ্রহণ করে,

পি চিদাম্বরম

মাওবাদী সন্ত্রাসের মোকাবিলার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

বিহার-এর মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের মতে, নকশাল সন্ত্রাসজনিত সমস্যা কোনও মতেই রাজ্যের একক বিষয় নয়। এটিকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে কেন্দ্র সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যকে সবরকমে সাহায্য করা এবং আইন-কানুন বজায় রাখার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া যে সকল মাও-ক্যাডার ভুলপথ পরিত্যাগ করে, সমাজের মূল স্রোতে মিশতে চান তাঁদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ওই মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেন, নকশালবাদীরা তাদের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করেছে। তাদের আন্দোলন এখন সামরিক কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত গত কয়েক বছরে মাওবাদীরা পশ্চিমবঙ্গেও একের পর এক আঘাত করেছে। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে সবক্ষেত্রেই

রমণ সিং

শাসক দলের নেতা কর্মীরা খুন হলেও রাজ্য সরকার কোনও বিশেষ সাফল্য পায়নি। তবে বুদ্ধ বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়িতে নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। এখন সেখানে কিন্তু হিংসার কোনও চিহ্ন নেই। অর্থাৎ নকশালবাড়ি থেকে নকশালরা মুছে গেলেও, অন্যত্র আগের মতো হত্যার রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। ছত্তিশগড় যে সাফল্য পেয়েছে তার ছিঁটেফোঁটাও পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের নেই।

রাজধানীতে বাড়ছে অপরাধের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত এক বছরে রাজধানীতে যে সকল মারাত্মক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে দিল্লী পুলিশ তার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই নিয়ে পরপর দু'বার পুলিশ কমিশনার হিসেবে বাৎসরিক সাংবাদিক সম্মেলন করলেন পুলিশ কমিশনার ওয়াই এস দাদওয়াল। তবে তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যানেও সাফল্যের থেকে ব্যর্থতার খতিয়ানই বেশি করে নজরে পড়ছে। যদিও শ্রীদাদওয়াল দাবি করেছেন, দিল্লীতে অপরাধমূলক ঘটনা কমেছে। পুলিশী ব্যর্থতা প্রকটভাবে দেখা গেছে — গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর মেহরোলিতে বোমা বিস্ফোরণ, বৈদ্যুতিন মিডিয়ার সাংবাদিক সৌম্যা বিশ্বনাথন হত্যা এবং কলসেন্টার কর্মী শালিনী সাক্সেনা হত্যাকান্ডে।

দু'ঘন্টা ব্যাপী সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদাদওয়াল ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেছেন, আগের তুলনায় সামগ্রিকভাবে অপরাধের ঘটনা ২৮ শতাংশ কমেছে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের অধীনে অপরাধ ১৩ শতাংশ কমেছে। মারাত্মক জঘন্য অপরাধও ১২ শতাংশ কমেছে। অমীমাংসিত অপরাধমূলক ঘটনার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে পুলিশ কমিশনার বারবারই হোঁচট খেয়েছেন। নির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, জনসমক্ষে তা প্রকাশ পেলে অপরাধীদের সুবিধা হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ২৭ সেপ্টেম্বর মেহরোলি বাজারে টিফিনবাক্স বোমা বিস্ফোরণে তেরো বছরের একজন কিশোর নিহত এবং অন্য ১৭ জন আহত হয়েছিল। দক্ষিণ দিল্লীর পুলিশ এব্যাপারে এখনও তদন্ত করছে। ২৭ বছর বয়স্কা সৌম্যা বিশ্বনাথন বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম 'হেডলাইনস্ টুডে'-র সাংবাদিক ছিলেন। নিজের গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে গত বছর ৩০ সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন। ২৫ বছরের কল সেন্টারের কর্মী শালিনী সাক্সেনাকে গৌতম নগরে তার হস্টেলের কামরায় মৃত পাওয়া গিয়েছিল। দিল্লী পুলিশ-এর এলাকায় সরকারিভাবে নথিভুক্ত হত্যার সংখ্যাটা ২০০৮-এ ৫১৮ জন।

শ্রীদাদওয়াল আরও জানিয়েছেন যে, হত্যার ঘটনা গত বছর বেড়েছে। তবে মাত্র দশ শতাংশ ঘটনায় ক্রিমিন্যালরা জড়িত। পুরনো শত্রুতার কারণে হত্যার ঘটনা ১৬ শতাংশ, সম্পত্তিগত কারণে পারিবারিক বিরোধে ১১ শতাংশ, হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে খুন করার ঘটনা হল ১৭ শতাংশ।

শ্রীদাদওয়াল-এর প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আগের বার দিল্লী পুলিশ মাত্র ৭.৯৪ শতাংশ কেস সমাধান করতে পেরেছিল। এবার সাফল্যের হার নাকি অনেক বেশি।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

।। তিন।।

।। সাপের আরেক ফণা ঃ দীন্‌দার আঞ্জুমান।।

ভারত সরকার একটি নোটিফিকেশন-এ দীন্‌দার আঞ্জুমান-এর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ২৮ এপ্রিল (০১), শনিবার। এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ — অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও গোয়ার চার্চে বোমা বর্ষণের। গত বছর মে ও জুলাই মাসে এদের পরিকল্পনায় ছিল সুরক্ষা কেন্দ্র, রেলওয়ে, টেলিকমিউনিকেশন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অয়েল রিফাইনারিগুলিতেও আক্রমণ করা।

সরকার কেন এই দীর্ঘ সময় নিয়েছেন দীন্‌দার আঞ্জুমান-র বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে — এই প্রশ্নের উত্তরে গৃহমন্ত্রকের প্রবক্তা জানান — এটা করতে অনেক সময়

পাকিস্তানের মর্দানের সঙ্গে ৭৫ বছরের আঞ্জুমানের সংযোগ রয়েছে। ভারতের অসন্তুষ্ট মুসলমান যুবকদের একত্রিত করে একটি উগ্র গোষ্ঠী সৃষ্টি করে জেহাদ (হোলি ওয়ার)-এর মাধ্যমে সমগ্র উপমহাদেশে ইসলামীকরণ ছিল এদের উদ্দেশ্য।

লেগেছে, কারণ অভিযোগগুলি ভালোভাবে তদন্ত করে 'Prima Facie' প্রতিষ্ঠা করা। নিষেধাজ্ঞা জারির পূর্বে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীটি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল এবং এদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে পাকিস্তানের আই-এস-আই-এর সঙ্গে। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে গোষ্ঠীটি খুবই সক্রিয়। তারা খৃস্টান বিরোধী কাগজপত্রও প্রচার করে আসছিল, সংশ্লিষ্ট ছিল গোয়েন্দাগিরির কাজে যা দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিরোধী এবং সামগ্রিকভাবে ছিল দেশের শান্তির প্রতিকূল, ভারতের সুরক্ষার বিপরীত বিঘ্ন ঘটিয়েছিল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের। তিনি আরও জানান — পাকিস্তানের মর্দানের সঙ্গে ৭৫ বছরের আঞ্জুমানের সংযোগ রয়েছে। ভারতের অসন্তুষ্ট মুসলমান যুবকদের একত্রিত করে একটি উগ্র গোষ্ঠী সৃষ্টি করে জেহাদ (হোলি ওয়ার)-এর মাধ্যমে সমগ্র উপমহাদেশে ইসলামীকরণ ছিল এদের উদ্দেশ্য।

আই এস আই যে কতটা বেপরোয়া মে-মাসের প্রথমেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল — ভূপিন্দর ত্যাগীর গ্রেপ্তারের মধ্যে। নেপালে সে আই এস আই -এর একজন অতি বিশ্বস্ত এজেন্ট। লুঠ, দস্যুবৃত্তি, হত্যাকর্মে বিহার রাজ্যে সে বিভীষিকা। সে প্রায়ই টাটা সাফারিতে ভারতের সীতামারি থেকে নেপালের বীরগঞ্জে যাতায়াত করে এবং ভারত থেকে যখন নিরাপদ আশ্রয়ের দরকার তখন আশ্রয় নেয় নেপালে গিয়ে। বিহারের এক কুখ্যাত মাফিয়া নেতার সংস্পর্শে আসে সে দু'হাজার সালের নভেম্বর মাসে। এরপর থেকে তার সহযোগী রমেশের সঙ্গে প্রায়ই বীরগঞ্জে গিয়ে নেপালী মাফিয়া-মাস্তানের বাড়িতে সাক্ষাৎ করে। এই মাফিয়ার আবাসেই 'জৈন' কোড নামের-এক আই এস আই এজেন্টের সঙ্গে তার পরিচয়। 'জৈন' তাকে জিজ্ঞেস করে সে চমকপ্রদ কিছু কাজ করতে চায় কিনা। এখানে তাদের প্ল্যান তেহেলকা এডিটর তরুণ তেজপালকে হত্যার। ত্যাগী লোকজন নিয়ে যখন টাটা সাফারিতে কার্যসিদ্ধি করতে যাচ্ছিল, তখনই পুলিশের স্পেশাল সেলের হাতে তারা ধরা পড়ে। তরুণ তেজপালের ব্যাপারে আই এস আই উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের দুস্কৃতীদের নিয়োগ করেছিল। 'তেহেলকা ডট কম্'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও এডিটর ইন চীফ তরুণ তেজপাল নিজের একদম কোনও ধারণা নেই কেন তার উপরে এমন আক্রমণ চালাবার প্ল্যান করা হয়েছিল। কিছুদিন আগে তেহলকা ওয়েবসাইটে অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দুর্নীতি বিষয়ে চাঞ্চ ল্যকর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। ফলে তরুণ তেজপাল নিহত হলে লোকেদের কাছে সরকারই সন্দেহভাজন হয়ে উঠতেন এবং দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হতো। অনুমান করা হয় — আই এস আই এই জন্যেই তেজপাল এবং তার এক সহযোগী অনিরুদ্ধ বহালকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। ত্যাগীকে এ-জন্যে দশ লাখ টাকার পারিশ্রমিক দেবার কথা বলা হয়েছিল। পুলিশী সূত্রে জানা যায়—জাহাঙ্গীরপুরীতে বিকেল সাড়ে চারটেয় ত্যাগী তার পাঁচ সঙ্গীসহ ধরা পড়ে। তার গাড়িতে ছিল AK-৪৭, দুটি রাইফেল, ছোট চীনা পিস্তল, একটি বুলেট প্রুফ জ্যাকেট এবং তেজপাল ও বহালের ফোটোগ্রাফ, সেইসঙ্গে তেহেলকার সোয়ামি নগর অফিসের সাইট প্ল্যান। পুলিশ এখন আই এস আই-পুষ্ট ত্যাগীর দ্বিতীয় সাহায্যকারী দলের লোকেদের সন্ধানে রয়েছে যাদের নেপাল থেকে আরও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুটি চুরি করা গাড়িতে আসবার কথা। তেজপালের আবাস ও অফিস বাড়ি ঘুরে ফিরে দেখবার পরে ত্যাগী এই সাহায্য চেয়েছিল, কারণ দিল্লী পুলিশ জেড ক্যাটেগরির সর্বাধিক তেজপালকে ঘিরে রেখেছিলেন।

মে-মাসের প্রথমেই আরেকটি চাঞ্চ ল্যকর তথ্যে আই এস আই -এর জড়িত থাকার কথা জানা যায়। সি বি আই, ওলগা

তরুণ তেজপাল

কোজিভেরা নামে উজবেকিস্তানস্থিত এক মহিলা-সংশ্লিষ্ট সংগঠিত স্মাগ্লিং-এর তদন্ত করে, আই এস আই-এর জড়িয়ে থাকার সন্ধান পায়। এক সি বি আই সূত্র সাংবাদিকদের জানান — ওল্‌গা উজবেকিস্তান থেকে শুধু ভারতেই আসত না, পাকিস্তানেও যেত। সে তাশখন্দ থেকে দিল্লী এবং পাকিস্তানে যেত। সাধারণত প্লেনে ইকনমি ক্লাসে যাতায়াত করত। কিন্তু পাকিস্তান থেকে ভারত আসত সর্বদা এক্সকিউটিভ ক্লাসে। সি বি আই-এর অনুমান — পাকিস্তানের কেউ খুব ধনী এবং গুরুত্বপূর্ণ তার দেখাশুনা করতো। কিন্তু প্রশ্ন ঃ আই এস আই কি আফগান এজেন্ট মামুর খান ও দেল আগা-র সঙ্গেও যুক্ত এবং ওল্‌গাকেও জড়িয়ে নিয়েছে ভারতে অস্ত্রশস্ত্রের চোরাকারবারিতে?

ওল্‌গার গতিবিধি ও কাগজপত্রের সঙ্গে সি বি আই-এর পর্যালোচনায় রয়েছে ৪৮ জন সিনিয়র ও মাঝারি কাস্টম অফিসারেরও কাগজপত্র ও ফোন কল ইত্যাদি। সি বি আই সূত্র থেকে জানা যায় — মামুর খান দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে করাচিতে রয়েছে এবং দেল আগা আজ পর্যন্ত ভারতে বিচারাধীন।

।। চার ।।

সত্যিই মহাপুরুষ ব্যক্তি পূর্বতন পাকিস্তানি ডিপ্লোম্যাট মোহাম্মদ আর্শাদ। চীমা (তার ফোটোগ্রাফের দিকে ভলোভাবে তাকিয়ে দেখবেন — জীবন্ত মানুষটিকে দেখবার সুযোগ অসম্ভব বলেই মনে হয়)। কান্দাহারে ভারতের IC ৮১৪ বিমানটির হাইজ্যাক করার পশ্চাতে তার একটি মুখ্য ভূমিকা আছে, ভারতে ৫০০ টাকার জাল নোট ছড়াবার ব্যাপারেও। নেপালে "আই এস আই বস" চীমা বেশ ভালোভাবেই ভারত-বিরোধী কর্মকান্ড করে যাচ্ছিল। কিন্তু বন্ধু রাষ্ট্র নেপালের পুলিশ মন্ত্রীর গাড়িতে তাকে মাত্র ১৬ কেজি আর ডি এক্স সহ গ্রেপ্তার করে সবকিছু ভন্ডুল করে দেয়, সে কথা আবার নেপালি মিডিয়ায় প্রচারিতও হয়। 'ভিয়েনা কনভেনশন'-এর জিগির তুলেও চিঁড়ে ভিজল না, তাকে বহিস্কৃত করা হল নেপাল থেকে।

তা, চীমার মতো 'প্রতিভাবান' ব্যক্তি কি চুপ করে থাকার পাত্র? ভারতীয় আর্মি এবং কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স হঠাৎ আই এস আই -এর এমন কতকগুলি পরিকল্পনার (ব্লু প্রিন্ট) কথা জানতে পারে যা উত্তর বাংলায় আর্মিকে চমকে দেয়। আই এস আই -এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উত্তর বাংলাসহ সন্ত্রাস-ত্রস্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি।

এই কর্মসূচীতে একজন ছিল গোর্খা লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রধান ছাত্র সুববা। তাকে তখন পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় — চীমা সুববার সঙ্গে দেখা করে কর্মপদ্ধ তি ঠিক করে — সুববা যখন পূর্ব নেপালের এলামে ছিল। চীমা অবসরপ্রাপ্ত আর্মির লোকেদের ইউ এন এ-তে ভালো পদের লোভ দেখিয়ে দলে আনবার চেষ্টা করত। প্রথমে তাদের সৌদি আরবে পাঠিয়ে, যেখানে তারা আগে কাজ করেছে, সেখানকার সমর সংক্রান্ত গোপন তথ্য জেনে নিতে চাইত।

ভারত-নেপাল সীমান্তে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অসংখ্য মাদ্রাসা সন্দেহ উদ্রেক করেছিল সুরক্ষা কর্মীদের।

"নেপাল সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি যে আই এস আই-এর অতি অনুকূল, সিদ্ধার্থ নগরের মাদ্রাসাগুলি তার জীবন্ত উদাহরণ। আই এস আই এজেন্টরা এখান থেকে ভারতকে নানাভাবে অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করে। অল-জামাত-উল-ইসলামিয়া মাদ্রাসায় সিমি কর্মীরা আই এস আই এজেন্টদের সঙ্গে মিলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে পুলিশ এসে, হিংসা ও অসদ্ভাব প্রচারের অভিযোগে একজন শিক্ষক ও তিনজন ছাত্রকে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

সৌভাগ্যক্রমে ১২ জুন নেপাল সরকার জানতে পারেন যে, আই এস আই নেপালে ভারতবিরোধী দাঙ্গার পরিকল্পনা করেছে। ফলে নেপাল সরকার যথোচিত ব্যবস্থা নিয়ে একজন ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের গ্রেপ্তার করেন। এই প্রাক্তন মন্ত্রী আই এস আই-এর একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী।

নেপালে রাজকীয় হত্যাকান্ডের পরে আই এস আই প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছিল নেপালে ভারতবিরোধী গুজব ছড়াতে। পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদে 'জঙ্গ' সংবাদপত্র নানা প্রতিবেদনে প্রচার করেছিল — হত্যাকান্ডের পেছনে ভারতের ভূমিকার অভিযোগ এনে। পাক-সংবাদপত্রের বহু ফোটোকপি করে, আই এস আই তা নেপালে বহুল পরিমাণে প্রচার করে। পাকিস্তানের এইসব খবর তখন নেপাল সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। এগুলি যে সুপরিকল্পিত তা একটি সংবাদসূত্রে — আই এস আই-এর কাঠমন্ডুতে ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মেজর মজিদের সঙ্গে তিনজন নেপালী ভাষার সংবাদপত্রের সম্পাদকের সাক্ষাৎকারের খবরে প্রকাশ পায়। ভারতবিরোধী দাঙ্গা শুরু করার সূচনাতেই প্রাক্তন নেপালী মন্ত্রী গ্রেপ্তার হওয়ায় আই এস আই নিজেদের প্ল্যান স্থগিত রাখে। নেপালের প্রয়াত রাজা বীরেন্দ্র এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গিরিজাপ্রসাদ কৈরালা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, নেপালের এক ইঞ্চি জমিও ভারতবিরোধী কর্মে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু বিশ শতকের শেষ দশক থেকে বেশ কিছু বছর পাকিস্তান আই এস আই ভারতবিরোধী কর্মে নেপালে জাঁকিয়ে বসেছে। ইন্‌স্টিটিউট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস'-এ একটি চমৎকার বিশ্লেষণে 'পাকিস্তান্‌স ফিফ্‌থ এস্টেট : আই এস আই ডিরেক্টরেট' প্রকাশিত রচনায় দেখানো হয়েছে কীভাবে পাকিস্তান পুরো ১৯৯০ সাল থেকে ভারত-বিরোধী অন্তর্ঘাত কার্যকলাপ, দুষ্ট কৌশলে ব্যাপৃত। এই বিশ্লেষণে কয়েকটি কোম্পানীর নামও করা হয়েছে যারা নেপালে কাজকর্মের কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে। আই এস আই এদের সামনে রেখে নিজেদের কুকর্ম করে। ১৯৯৪ সালে ইসলামাবাদস্থিত সাচাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নেপাল সরকারের মেরামতের কাজ পেয়েছিল মুঙ্গলিং-পোখরা হাইওয়েতে — যেটি কাঠমান্ডুর সঙ্গে পোখরা শহরকে যুক্ত করে। যদিও কোম্পানিটিকে দু'বছরের কন্ট্র্যাক্ট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরেও বেশ কয়েক বছর ধরে তারা কাজ করে যাচ্ছিল।

অনেক পূর্বতন আই এস আই প্রধান ইউরোপীয় দেশে কূটনৈতিক পদে বহাল রয়েছে। ইসলামাবাদের নিউক্লিয়ার শক্তির অগ্রগতিতে সাহায্য করাও তাদের কাজ।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সন্ত্রাসী আক্রমণের পশ্চাতে অর্থের যে লেনদেন চলেছে তার সূত্র পাকিস্তানে রেনিগেড আই এস আই সংযোগ, রেনিডেগ আই এস আই কর্মকর্তাদের কান্দাহার পদার্পণের কথাও জানা যায় যাতে তালিবানরা আমেরিকান আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের সমর-কৌশল নির্ণয় করতে পারে। এর ফলে ক্রুদ্ধ মুশারফ আই এস আই-র শীর্ষে রদবদল-ও করেছিলেন। আহমেদ রশিদ নামে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এক ব্যক্তি তালিবানদের উপরে একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে অনেক খবর জানা যায়। রশিদের বইটি পাশ্চাত্য মহলে যে খুবই সমাদৃত তার প্রমাণ পাওয়া যায় রশিদের একটি নিবন্ধে। একই সঙ্গে লন্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ও 'দ্য ওয়াশিংটন টাইমস্'-এ প্রকাশিত হয়। রশিদের লেখা অনুযায়ী আই এস আই কর্মকর্তারা তালিবান আর্মির উপদেষ্টা রূপে কাজ করেছে, বিশেষ করে তালিবানদের বিরুদ্ধে গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের সময়ে। অনেক আই এস আই অফিসার তালিবানদের এবং তাদের কট্টর ইসলামী রীতি-নীতির খুবই অনুগত।

য়োসেফ বোডানস্কি নামে ইজরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত একজন মিলিটারি বিশ্লেষক আই এস আই-এর সঙ্গে তালিবানের সম্পর্ক এবং তালিবানকে উৎসাহ দেওয়া নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। প্রথম দিকে আই এস আই-তালিবান সম্পর্ক সম্বন্ধে আমেরিকা সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখলেও ৯/১১-এর পরে তালিবানদের বিরুদ্ধে আমেরিকা উদ্যোগী হয়ে ওঠে। সি আই এ এখনও পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নিচ্ছে তালিবানদের মধ্যে বিভেদ ও ব্যবধান সৃষ্টির জন্যে। এটা বোঝা অবশ্য খুবই কঠিন — কারা যথার্থই সন্ত্রাস বিরোধী এবং কারা তালিবান সমর্থক।

ভারত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে — অনেক পূর্বতন আই এস আই প্রধান ইউরোপীয় দেশে কূটনৈতিক পদে বহাল রয়েছে। ইসলামাবাদের নিউক্লিয়ার শক্তির অগ্রগতিতে সাহায্য করাও তাদের কাজ।

(চলবে)

আত্মসমীক্ষা ও আত্মরক্ষার উপাদানে ঠাসা একখানি বই

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

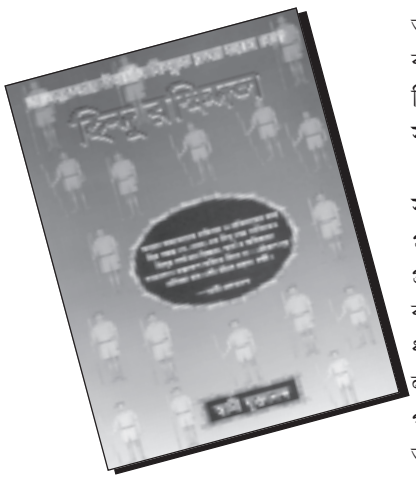

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় দিব্যচক্ষে বাঙালির ভবিষ্যৎ ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ ছবি দেখতে পেয়েই পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করে বলেছিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে?"

আর হিন্দুজাতির এই দুর্দশার কারণ নির্ণয় করে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন — "হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে"। অর্থাৎ যেদিন থেকে বাঙালি যুবকশ্রেণী লাঠি ভাঁজা ছেড়েছে, সেদিন থেকে বাঙালির পায়ের তলার মাটি সরতে শুরু করেছে। মা-বোনের ইজ্জত রক্ষায় তার অসহায়তা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইংরেজ আমলের ১৫০ বছর শাসন-শৃঙ্খলার মাঝে বাস করে মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার ভার বিদেশী সরকারের উপর ছেড়ে দিয়ে হিন্দুরা নিশ্চিন্ত ও নিঃচেষ্ট হয়ে বসেছিল। ভেবেছিল এসুখেই দিন যাবে।

স্বদেশী আমলে বাঙালির সুপ্ত তেজবীর্য কিঞ্চিৎ জেগে উঠলেও, অনতিবিলম্বে বৃটিশ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীকে আমদানি করল এবং তাঁর অহিংস নীতির শান্তি জল ছিটিয়ে বৈপ্লবিক অগ্নিশিখা স্তিমিত করে বিদেশী শাসকের মুখে হাসি ফোটালেন — আর ভারতবাসী "রঘুপতি রাঘব রাজারাম" বলে দু'হাতে চাপাটি পিটতে লাগল।

যে জাতির মাথায় রামায়ণ, মহাভারত। বুকে গীতা — যার মর্ম কথা ক্লীবতা পরিহার করো — সে জাতিকে অত্যাচারী দুর্জনকে ভাই বলে ক্ষমা ও বুকে টেনে নেবার পরামর্শ যিনি দেন, তিনি জাতির অবৈধ জনক; জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে গেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের মতো কবি মনীষীও "অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে" উভয়ের উপর বিধাতার অভিশাপ বর্ষণ করে গেছেন। ক্ষমা করার কথা বলেননি।

যে হিন্দুজাতি রামায়ণ, মহাভারত গীতার ঐতিহ্যধারী, যাদের আরাধ্য সমস্ত দেব-দেবী সশস্ত্র ও প্রহরণধারী, সেই যোদ্ধা জাতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে সব অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করে, মহাস্থবিরত্ব প্রাপ্ত হল এবং অদূর ভবিষ্যতে বর্বর মুসলিম আক্রমণকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হল। হিন্দুর সর্বনাশ করে বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে লুপ্ত হল। কিন্তু ভারতের বাইরে যে কয়টি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম একমাত্র ধর্ম হিসাবে টিকে রয়েছে চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, থাইল্যান্ড লাওস, ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা — তারা বুদ্ধের পূজা করে বটে; কিন্তু কেউই অহিংসা পরম ধর্মে বিশ্বাসী নয়। তারা অস্ত্র-শস্ত্রে যেমন বলীয়ান, অর্থ-সম্পদেও অগ্রগামী। যুদ্ধ বিগ্রহে তারা ভীত নয়। যুদ্ধ বিগ্রহে নিজেরাও মরছে, অন্যকেও মারছে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিধর্মী বর্বরের দল যখন সুপরিকল্পিত ভাবে হিন্দুদের উপর চড়াও হল, তখন হিন্দুরা কারও প্রেরণা বা শিক্ষায় নয় — আত্মরক্ষার তাগিদে মা-বোনের মান সম্ভ্রম রক্ষার কর্তব্যবোধে জেগে উঠেছিল। বিধর্মী দুর্জনদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিল। তখন আবার গান্ধী এসে হিন্দুদের সামনে দাঁড়ালেন এবং হিন্দুদের উদ্ধত ফণাকে অহিংসার লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করলেন। গান্ধীর অপঘাত মৃত্যু অনেক পাপের কথা। দ্রৌপদীর ক্রোধানলে যেমন কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; ১৯৪৬-৪৭ সালে মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে নির্যাতীত অপহৃত হিন্দু শিখ নারীদের অভিশাপেই গান্ধীর এই শোচনীয় মৃত্যু।

হিন্দুদের মধ্যে অত্যাচারী বিধর্মীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের যে স্পৃহা জেগে উঠেছিল, গান্ধীর মুখ্য চ্যালা নেহরু ধর্মনিরপেক্ষতার মাদক খাইয়ে তাদের সমস্ত চিন্তা শক্তি, মান-অপমানবোধ অসাড় করে দিয়েছেন। এখন চোখের সামনে মা-বোনের ইজ্জত হানি ঘটতে দেখলেও হিন্দু বাঙালি সন্তানের চিত্তবিকার ঘটে না। তারা চোখ বুঁজে ধর্মীয় ঐক্য ও সংহতির মন্ত্র জপে।

বাঙালি হিন্দুর জীবনে এই দুর্দশা নতুন নয়। ম্যাকডোনাল্ড এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দৌলতে বাংলার শাসনভার মুসলমানদের হাতে যেতেই হিন্দুদের জীবনে নেমে এলো নবাবী ও সুলতানী আমলের অন্যায় অত্যাচারের প্লাবন। সেই একই ইতিহাস — হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীহরণ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে বিধর্মীর উপর যেসব ব্যবস্থা প্রয়োগের বিধান রয়েছে, সেসব নির্বিচারে প্রয়োগের অবাধ অধিকার। ইংরেজ সরকার চুপ করে মজা দেখতে থাকে।

বাঙালি জীবনে এই ঘোর দুর্দিনের সময়'মাভৈঃ' বলে আবির্ভূত হলেন স্বামী প্রণবানন্দ — ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাঙালি হিন্দুকে ডাক দিয়ে বললেন — "বাংলার হিন্দু আজ বিপন্ন। ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ সকল ক্ষেত্রে হিন্দু আজ লাঞ্ছিত, নিপীড়িত। দুষ্ট-দুর্বৃত্তের কবল হতে পল্লীবাসী হিন্দুকে রক্ষা করতে হলে তাদের আত্মরক্ষার্থে উদ্যোগী ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। .... বাংলার হিন্দুগণের উপর চতুর্দিক হতে অবিরত যে আঘাত আক্রমণ আসছে, তাতে হিন্দু সমাজ আজ ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত। এই সর্বজনীন বিপদের সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদ-বিবাদ, অনৈক্য-পার্থক্য ভুলে আত্মরক্ষার্থে হিন্দু জন সাধারণের মিলন ও সঙ্ঘবদ্ধতা সহজ ও স্বাভাবিক আত্মরক্ষার্থে প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণে শক্তির অনুশীলনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগানো চাই। হিন্দুর মান, সম্ভ্রম, ধর্ম, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার তীব্র সঙ্কল্প ও দায়িত্ববোধ সকলের প্রাণে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘের রক্ষীদল গঠন আন্দোলন। এর মধ্যে দিয়েই হিন্দু জাতির লুপ্ত শৌর্য-বীর্য পুনর্জাগ্রত হবে।"

আলোচ্য গ্রন্থের এটিই হল সারকথা। গ্রন্থকার স্বামী যুক্তানন্দজী ভারতে মুসলিম আগমন ও শাসনকালে হিন্দুদের উপর ভয়াবহ অত্যাচারের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, হিন্দু সমাজের দুর্বলতার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী করার ও সামাজিক ব্যাধি দূর করার যেসব ঔষধ বাতলেছেন তা বিস্তৃতভাবে বলেছেন এবং সর্বোপরি, হিন্দু রক্ষীদল গঠনের আনুপূর্বিক ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। স্বাধীনতার ৬১ বছর পরেও যে পশ্চিম বাংলার হিন্দু সমাজ মান-ইজ্জত রক্ষার প্রশ্নে ১৯৪৬-৪৭ সালের মতো অসহায় অবস্থায় পতিত হবে, তা কে জানত! কিন্তু বাস্তবে সেই করুণ দৃশ্যেরই পুনরাভিনয় ঘটছে।

প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক বাঙালি হিন্দুর ঘরে রক্ষিত ও পাঠিত হওয়া উচিত। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন যে হিন্দুধর্মের মর্মবাণী, তারা কেন বিধর্মীর হাতে পড়ে পড়ে মার খাবে? মঠে-মন্দিরে গিয়ে লম্বা লাইন দিয়ে খিচুড়ি খেয়ে আত্মপ্রসাদ লাভে আত্মবিনাশ ঠেকানো যাবে না।

আত্মরক্ষায় উদাসীন হিন্দুকে রক্ষা করবে কে?

হিন্দু রক্ষীদল ঃ স্বামী যুক্তানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ,
২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ,
কলকাতা-১৯,
মূল্য - ৩৫.০০টাকা

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতায় এক উজ্জ্বল গ্রন্থ

দীপক গঙ্গোপাধ্যায়

সময়টা ১৮৯৭ সাল। স্বামী বিবেকানন্দ তখন আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরেছেন। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বালগঙ্গাধর তিলক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রণাম করলেন। স্বামীজীকে তিলকজী প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজী, ভারত কবে স্বাধীন হবে?" স্বামীজী চটজলদি বললেন, যদি

কালই হয়! এমন উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তিলকজী চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর মৌনতা ভেঙ্গে স্বামীজী বললেন, স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, তবেই স্বাধীনতা আসবে। একই সঙ্গে তিনি আরও বললেন, এই দেশ স্বাধীন হতে এখনও পঞ্চাশ বছর সময় লাগবে। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে আরও পঞ্চাশ বছর। সত্যিই আমরা দেখলাম ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু এই দেশের প্রাণভোমরা যে ধর্ম তার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠতে প্রায় পঞ্চাশ বছরই সময় লাগলো। অর্থাৎ হিন্দুত্বের ভিত্তিতে হিন্দুস্থানের উন্নয়ন সংগঠিত হিন্দু শক্তির দ্বারা হবার যে বিধিলিপি তা কিন্তু গত এক দশক ধরে ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। আর এই খানেই ফুটে উঠে আরেক মহাপুরুষ, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় চরম তেজদীপ্ততার সঙ্গে নিরন্তর ঘোষণা করে গেছেন আমি প্রতিটি হিন্দুকে 'আমি হিন্দু আমি হিন্দু জপ করাবো'। আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগেও যেখানে হিন্দু শব্দটি বলতে গেলে সংকোচ বোধ হতো এখন কিন্তু তা অনেকটা পরিবর্তিত। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই হিন্দুত্বের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ গবেষণা শুরু হয়েগেছে। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে হিন্দুর কদর। তবুও আজকের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, হিন্দুত্ব, হিন্দু আর হিন্দুস্থানের মধ্যে এখনও সেভাবে গভীর সংযোগ হয়ে ওঠেনি। এই সংযোগ অদূর ভবিতব্য তথাপি এর ফাঁক-ফোকরের কথা এই মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তত মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে দেশজুড়ে যে নাটক চলছে, তা জেনে বুঝেও কোটি কোটি হিন্দুকে অবুঝ থাকতে হচ্ছে।

এই যে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি-এর থেকে উত্তরণের যথার্থ পথ নির্মাণ করে গেছেন সেই মহাপুরুষ যিনি বলেছিলেন, প্রতিটি হিন্দুকে আমি হিন্দু জপ করাবো। তার সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কর্মপন্থার অভিব্যক্তিই হল 'হিন্দু মিলন মন্দির'। হিন্দু মিলন মন্দির গঠনই ওই অদ্ভুত পরিস্থিতি কাটিয়ে, হিন্দুত্ব, হিন্দু আর হিন্দুস্থানের মধ্যে সুষ্ঠু সংযোগ গড়ে তোলার এক অনন্য পন্থা। হ্যাঁ তিনি হলেন যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ। যখন তিনি এই অভূতপূর্ব কর্মপন্থা চালু করার কথা ঠিক

(এরপর ১৩ পাতায়)

অভিজিৎ রায়চৌধুরী

ঊনিশটি প্রবন্ধের সংকলন — ৬৮ পাতা সম্বলিত বইটি "চোখে আঙুল দাদা'র" মতো (Eye Opener) ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তৎপরবর্তী কালের রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহের বিবর্তনে যে রাজনৈতিক দর্শনের বীজ দেশের মাটিতে বপন করা হয়েছিল তারই অনিবার্য ফসল ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজন। সাম্প্রদায়িকতা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা, রাজনৈতিক দুরাচার ও দুর্বৃত্তায়ন, জেহাদি কার্যকলাপের বাড়-বাড়ন্ত ইত্যাদি। অথচ এই বিষয়গুলির দিকে দেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের পরিবর্তে, আমাদের দেশের অধিকাংশ বুদ্ধি জীবী সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার এক অপপ্রয়াসে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। আর এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদী, তাঁদের অন্যতম আলোচ্য বই-এর প্রবন্ধগুলির লেখক রবীন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। কিশোর বয়স থেকেই সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত। সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত লেখাগুলি যেমন ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে, তেমনি সমস্যার উৎসমুখ গুলোও দেখিয়ে দেয়।

প্রথম প্রবন্ধ "আবার দলিত মুসলিম ঐক্য না দেশভাগের ষড়যন্ত্র"এ লেখক ইতিহাস থেকে প্রমাণ তুলে দেখিয়েছেন

ভারত বিভাজনে কালের এক রাজনৈতিক দলিল

কীভাবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের চক্রান্ত পূর্ণতা পেয়েছিল। আর আজ একই ভাবে দলিত মুসলিম ঐক্যের আড়ালে, পুনরায় ভারত বিভাজনের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এইভাবে বাকী প্রবন্ধগুলিতেও তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী। যাতে প্রায় ১০০ বছরের ইতিহাস সম্পৃক্ত রয়েছে। যে ইসলাম সম্পর্কে দেশের মানুষের কাছে এক মহৎ মানবিক ভাবমূর্তির প্রচার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা করেন, তার স্বরূপ কী বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক তাও দেখিয়েছেন। যে সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আজ সমাজে অতি সমাদরের সাথে আলোচিত ও প্রশংসিত হন তাঁদের প্রকৃত ছবিও প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায়। সংখ্যালঘু উন্নয়নের আড়ালে মুসলিম তোষণের পরিণতি দেশ ও সমাজকে কোন সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে তার তথ্যমূলক বিবরণ লেখক দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন

(এরপর ১২ পাতায়)

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ভোটব্যাঙ্ক

সম্প্রতি বিহারের কিশানগঞ্জে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মহাসম্মেলনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ডাকে কী কংগ্রেস ও সি পি এম পরিচালিত সরকার সাড়া দেবে? স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে এখনও এমন কোনও ব্যক্তিত্ব আসেনি, যারা এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কারণ এই দাবি নিয়ে ১৯৬০-এর দশক থেকে অসম আন্দোলন চলছে। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলো বাকচাতুরী ছাড়া এর পক্ষে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং আন্দোলনকে বিপথগামী করে বানচাল করার চেষ্টা করে আসছে। যার ফলে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজরাম এবং পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা একের পর এক বসতি স্থাপন করে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে চলেছে। আর এসব হচ্ছে স্থানীয় মুসলিম সংগঠনগুলির সহযোগিতায়। আমাদের দেশের কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলো চুপচাপ বসে এসব দৃশ্য দেখছে। কারণ কংগ্রেস সি পি এম চায় তাদের সুরক্ষিত সম্প্রসারিত মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক। কাজেই বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে ভারতের নিরাপত্তা যতই বিঘ্নিত হোক না কেন, তা নিয়ে ওইসব দলের কোনও মাথাব্যথা নেই। যদি ভারতের ক্ষমতা অন্য কোনও জাতীয়তাবাদী দলের হাতে আসে, তা হলেও যেসব ঘাঁটি তৈরি হয়েছে তা ভাঙ্গা সহজ হবে না। কারণ সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় অংশে লাল ঝাণ্ডা এমন প্রভাব ফেলেছে যে তারা ধরি মাছ, না ছুঁই পানি-এমন একটি মানসিক রোগে ভুগছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে যদি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মতো ছাত্র সংগঠনগুলো বলিষ্ঠ যুব সংগঠন গড়ে তোলে, তাহলেই একমাত্র ভারত বিরোধী কুচক্র ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলা সম্ভব হবে। আর তা সম্ভব হবে তখনই, যখন এই সব যুব সমাজ সরকার এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর,২৪ পরগণা।

সন্ত্রাসীদের মদতদাতা

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু এই ভারতবর্ষে আজ প্রায় ৩ দশক ধরে চলছে এমন এক প্রকার ইসলামিক ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রাসী আক্রমণ। আর এর পেছনে যে গভীর রহস্য লুকিয়েছে তা হল যে কোনও অবস্থাকে ভারতে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক তাবড় তাবড় নেতা, আমলাগণ আছেন তারা যেন কুম্ভকর্ণের ন্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নিরীহ সাধারণ মানুষকে কেন এই সন্ত্রাসের বলি হতে হচ্ছে? রাজনৈতিক নেতারা জেড, জেড প্লাস নিরাপত্তা নিয়ে থাকবেন আর সাধারণ মানুষকে কুকুরের মতো মেরে ফেলবে সন্ত্রাসীরা, আর সেখানে গিয়ে নেতারা টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে বোকা বানানো ছাড়া আর কিছু করবেন না। দেশের স্বার্থে সন্ত্রাস দমনে খরচ করুন। সন্ত্রাসবাদের মদতদাতাদের পাকিস্তান বা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। অন্যথায় এই সন্ত্রাস কোনওদিন থামবে বলে মনে হয় না। তাই এখন আমরা প্রত্যেক ভারতীয়র সমস্বরে বলা দরকার — সন্ত্রাসবাদী ও তাঁর প্রশ্রয়দাতাদের এই দেশ ছাড়তে হবে। ভারতবাসী ভাই ভাই, সন্ত্রাসবাদীর শান্তি চাই।

শ্যামলকান্তি নাথ, উত্তর কাছাড়, অসম

চিঠিপত্র

অনিয়মিত গ্যাস সরবরাহ

মেমারী শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিবেশিত অনিয়মিত রান্নার গ্যাস (ইন্ডেন) সরবরাহ সম্পর্কে দু'চার কথা — মেমারীর গ্যাস গ্রাহকদের এখন 'টকের জ্বালায়' পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাসার মতো অবস্থা। আগের পরিবেশক যদিও ধোয়া তুলসী পাতা ছিল না তবু চলছিল। কিন্তু এখন গ্রাহকদের খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে।

গ্যাস বুক করার পর আগে পাওয়া যেত ২১ দিনের মধ্যে, কিন্তু বর্তমানে একমাস বা তারও পর ছাড়া পাওয়া কোনও মতেই যায় না। কেউ হয় তো এক তারিখে বুক করল, সে তারটা পরের মাসের এক/দুই/তিন তারিখের আগে পায় না। অথচ বিল কাটা হয়েছে দেখা গেছে ২৭ তারিখে, গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে মাসের এক তারিখে। তাহলে ওই সিলিন্ডারটি পাঁচ দিন কোথায় ছিল। তাহলে কি যারা (ভ্যানওয়ালারা) বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দেয় তাদের কোনও কারসাজি — এসব বলেও কোনও সুরাহা হয়নি। নিয়মিত গ্যাস পাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানের পরিবেশকের যথেচ্ছাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

সংস্থাটি রবিবার বন্ধ থাকে। অথচ ভ্যানওয়ালারা রবিবার বাড়ি বাড়ি গ্যাস দেয়, তারা রবিবারে গ্যাস কোথায় পায়? আগের দিন নিয়ে তাদের নিজস্ব হেফাজতে রাখে এবং পরের দিন দেয় ওটাই কি গ্যাসের ওজন কম হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় — মেমারীর সংস্থাকে বলেও কোনও সুরাহা হয়নি। শুধু তাই নয়, ভ্যানওয়ালাদের নির্দেশ আছে গ্রাহককে ওজন দেখিয়ে দেবার, কিন্তু কোনও ভ্যানওয়ালাই তা দেখাই না। "আজ ওজন পরিমাপক ব্যবস্থাটা নেই বাড়িতে আছে, বিশ্বাস করুন ওজন ঠিক আছে" — এসব কাঁদুনি মার্কা কথা শুনতে হয়। অথচ একই রকম ব্যবহার করে কোনও কোনও বারে আগের তুলনায় ৫/৭দিন আগে গ্যাস শেষ হবার ঘটনা ভুরিভুরি।

এরপরও সাধারণ গ্রাহকগণ সময়ে গ্যাস পায় না। অথচ বিয়েবাড়িতে ক্যাটারারকে চাইলে ৮/১০টা সিলিন্ডার অবলীলায় উচ্চমূল্যে দিয়ে দেয়। কোথায় পায় তারা, কে তাদের সাপ্লাই করে। শুধু তাই নয়, মিষ্টির দোকানের জন্য বরাদ্দ আছে ১৯ কেজি ওজনের ব্লু-রং-এর সিলিন্ডার। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বহু দোকানে লাল রং-এর সিলিন্ডার দিয়ে ভালো ভাবেই মিষ্টি তৈরি করে যাচ্ছে। তারা পাচ্ছে কোথায়? তাদের ওই ব্যবসা করার জন্য লাল রং-এর কতগুলি কার্ড আছে? তাদের ঘরে সবসময় ২/৪টি সিলিন্ডার মজুত থাকে।

কিন্তু কাকে বলা হবে এই কথা। মেমারীর সংস্থাটি গ্রাহকদের কোনও কথায় কর্ণপাত করে না। যারা একটু চেঁচামেচি করতে পারে তাদেরই শুধু গোপনে সন্তুষ্ট করে — নিরীহরা অসুবিধা ভোগ করে।

সুতরাং দুর্গাপুরের ইন্ডেন গ্যাস সংস্থাকে অনুরোধ, সাধারণ গ্রাহকগণ যেন বুক করার ২০/২১ দিনের (স্বাভাবিক সময়ে) মধ্যে গ্যাস পায়। ভ্যানওয়ালারা যেন ওজন দেখাতে বাধ্য থাকে, আর গ্যাস নিয়ে ব্যবসা করা ক্যাটারারগণ ও মিষ্টির দোকানীগণ ডোমেস্টিক গ্যাসের অপব্যবহার না করতে পারে তার প্রতিরোধের যেন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়।

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

ভারত রক্ষা

সুকুমার দে

আমরা জানি পাকিস্তানের জন্ম ভারত ভেঙে। ভারত বাংলাদেশের জন্মদাতা। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ভারত স্বীকৃতি প্রদান করে। ১০ ডিসেম্বর যশোরের দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রায় বিনা যুদ্ধে ভারতের কব্জায় আসে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকার রমনা ময়দানে বৈকাল বেলায় ভারতের পূর্বাঞ্চলের সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা প্রধান আমীর আবদুল্লা খাঁন নিয়াজি, ৯৩ হাজার পাক সেনাসহ আত্মসমর্পণ করেন।

বঙ্গবন্ধু সেন মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধু বনে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুতা পূর্ণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ল। পাকিস্তানের Inter Service Intelligence (আই এস আই) সহ অন্যান্য পদাধিকারীরা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নানারকম ফন্দী ফিকির আঁটতে লাগল, কী করে ভারতকে দুর্বল করে — বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করে দেওয়া যায়।

১৯৮৭ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক একটা পরিকল্পনা তৈরি করে। তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের সেনা প্রধানেরা এবং পাকিস্তান একত্রে পাকিস্তানে মিলিটারী হেড-কোয়ার্টার কোয়েটাতে বসে "Operation Topak" নামক Plan তৈরি করে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে যে কোনও উপায়ে Hit and Run পদ্ধতিতে প্রচুর ক্ষতি করা এবং অনুপ্রবেশ ও উগ্রপন্থীদের প্রথমে কাশ্মীরে, পরে ভারতের সর্বত্র ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালাতে হবে। ভারত দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ঝটিকা আক্রমণ করে দিল্লী থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে কাশ্মীর দখল করে নিতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৯০ সালের শেষের দিকে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে Operation Topak -এর পরিকল্পনা চলে আসে। ইতিমধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় জিয়াউল হক মারা যান। Topak-এর কিছুটা সাফল্য পাকিস্তান পেলেও, তার পরিকল্পনা পরিপূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার পর বাংলাদেশের ঢাকায় বসে আই এস আই ও বাংলাদেশ একটা পরিকল্পনা

জনমত

তৈরি করে, তার নাম Operation "PIN CODE"। এই পরিকল্পনায় ছিল যে অনুপ্রবেশ, জালনোট, এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের ঢোকাতে হবে। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, অত্যন্ত কড়া নজরদারীতে বি এস এফ ও সেনাবাহিনী তৎপর হওয়ায়, পূর্ব সীমান্ত তারা বেছে নেয়। সীমান্তের এপারে, একশ্রেণীর লোক, অনুপ্রবেশকারী ও উগ্রপন্থীদের সহযোগিতা করে। তারা উগ্রপন্থীদের আশ্রয় দেয়, অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে ভারতে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতেরই কিছু যুবক ওই উগ্রপন্থীদের দলে ভিড়ে নাশকতার কাজ চালায়।

১৯৮৭/৮৮ সালের পর থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ সীমান্তে বহু উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে।

ভারতের গোয়েন্দা বাহিনী — পর পর বসিরহাট, ইটিন্ডা ঘাট বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে ঢোকার সময় বেশ কয়েকজন উগ্রপন্থীদের ধরে ফেলে। তাদের কাছ থেকে জানতে পারে যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উগ্রপন্থীদের দিয়ে

(এরপর ১৩ পাতায়)

আন্দামানে নেতাজীর প্রথম স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন স্মরণে অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ।। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আন্দামান নিকোবরের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইংরেজদের হাত থেকে আন্দামানকে ছিনিয়ে নিয়ে ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর স্বাধীন ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পোর্টব্লেয়ারের জিমখানা ময়দানে এবং বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানান সেলুলার জেল থানার সামনে।

নেতাজীর স্মরণে ডিগলিপুরে বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে একটি বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন ডঃ মৃণালকান্তি দেবনাথ। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙেঘর সহ সাধারণ সম্পাদক অজিত বিশ্বাস বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের অবদানকে কংগ্রেস সরকার সঠিকভাবে ইতিহাসে স্থান দেয়নি। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৩-এ নেতাজী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু স্বাধীনতার ৬১ বছর পরও নেতাজীর সেই স্বপ্ন আজও আমরা পূরণ করতে পারিনি। এ আমাদের জাতীয় লজ্জা।

আন্দামানের ডিগলিপুরের নেতাজী মেমোরিয়াল কমিটি এই উৎসব পালন করে। সকালে পতাকা উত্তোলন করেন ইন্ডিয়ান কোস্টাল গার্ডের কমান্ডিং অফিসার এস কে সাহু। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ১৯৪৩ সালে নেতাজীকে গার্ড-অফ অনার প্রদানকারী সেই জন লেবো। তিনি নেতাজীর ৩০ ডিসেম্বরের স্মৃতিচারণ করেন।

সকালে প্রায় ২০০ ছাত্রের শোভাযাত্রা সারা ডিগলিপুর পরিক্রমা করে। তারপর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গান, বক্তৃতা কুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা হয়।

বিকেলে সভার শেষে পোর্টব্লেয়ারের আদিত্য নাট্য আকাদেমির সদস্যরা নেতাজীর সম্পর্কে লিখিত একটি সুন্দর আলেখ্য উপস্থাপিত করে।

নেতাজী মেমোরিয়াল কমিটির সদস্য বিভাস বিশ্বাস, বীরেশ্বর কর্মকার, বাপি সাহা, এম এল দাস, সুশান্ত চৌধুরী, সন্ধ্যা দেবনাথ প্রভৃতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এই সমিতির পক্ষে ডাঃ মৃণালকান্তি দেবনাথ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আন্দামানে শিক্ষক সঙেঘর প্রথম সম্মেলন

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙেঘর আন্দামান নিকোবর শাখা

গঠিত হল। নাম — দ্বীপ শিক্ষক সঙঘ। গত ১২ ডিসেম্বর পোর্টব্লেয়ারে বিবেকানন্দ হলে মধ্য আন্দামানের শিক্ষকদের সম্মেলন হয়। সম্মেলনে শৈক্ষিক মহাসঙেঘর সহ সাধারণ সম্পাদক অজিত বিশ্বাস শিক্ষক সংগঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বলেন, এই শিক্ষক আন্দোলন সারা ভারতে চলছে। এই সংগঠন কেবল শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা নিয়েও তারা আন্দোলন করছে। দ্বীপ শিক্ষক সঙেঘর আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছেন ডাঃ মৃণাল কান্তি দেবনাথ ও কে এন সুরেশ। মধ্য আন্দামান জেলার ছোট সমিতি গড়া হয়েছে। এই সমিতিতে রয়েছেন ডঃ মঞ্জু নায়ার, আর এন বোস, সুনীতা দেশপাণ্ডে এবং কে পি বিশ্বাস।

উত্তর আন্দামান জেলার সম্মেলন হয় ডিগলিপুরে রব তীর্থমঞ্চে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মৃণালকান্তি দেবনাথ। শিক্ষক সঙেঘর সহ সাধারণ সম্পাদক অজিত বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। উত্তর আন্দামান জেলা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন হরবিলাস সরকার, সাধারণ সম্পাদক — কমল মন্ডল, সহ সম্পাদক — ললিতারাণী বিশ্বাস, বিধান সরকার, কোষাধ্যক্ষ — স্মৃতিকণা মণ্ডল। সহ সভাপতি — ধীরেন্দ্রনাথ সাধক এবং ডি কে রায়।

দুটি সম্মেলনেই ডাঃ মৃণালকান্তি দেবনাথের লেখা প্রথম উপন্যাস 'জেহাদ ও উদ্বাস্তু ছেলে" গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়।

দক্ষিণ অসমে শিক্ষাবর্গ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর দক্ষিণ অসমের লক্ষীপুর জেলার ৭দিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ বর্গ গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে লক্ষ্মীপুর গালর্স হাইস্কুলে হয়ে গেল। এই প্রশিক্ষণ বর্গে ১৫টি স্থানে থেকে ৩২ জন শিক্ষার্থী সহ মোট ৫৫ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিল। জেলা সঙঘচালক অমিত বরণ নাথ বর্গের উদ্বোধন করেন। এই বর্গে সঙেঘর অখিল ভারতীয় কার্যকরী মন্ডলের সদস্য শ্রীকান্ত যোশী, দঃ অসম প্রান্তের প্রান্ত প্রচারক বলরাম দাস রায়, প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ সুভাষ চন্দ্র নাথ, প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সুশান্ত সেন, বিভাগ ব্যবস্থা প্রমুখ রজত দেব, বিভাগ প্রচারক সঞ্জয় কুমার দেব, ডঃ শঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ কার্যকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে পথনির্দেশ করেন। সমারোপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃতকরেন ডাঃ জয় সিংহ।

পানাগড়ে অর্শচিকিৎসা শিবির

কাঁকসা বিবেকানন্দ সেবা সমিতির পরিচালনায় গত ১৩ ডিসেম্বর(২০০৮)। বর্ধমান জেলার পানাগড়ে একটি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে ডাঃ বি সি সাহা ইঞ্জেকশন পদ্ধতিতে মোট ২৫ জন রুগীর চিকিৎসা করেন। শিবিরে আসানসোল জেলা কার্যবাহ বিপ্লব রায় কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

ঈশ্বর হাসেন। হাসেন ঈশ্বর পুরুষরাও। ঈশ্বর হাসেন দু'বার। দুটি মানুষ যখন দড়ি নিয়ে একখণ্ড জমি মাপছে। বলে এটা আমার, ওটা তোমার। তখন একবার। ডাক্তার যখন মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়দের আশ্বাস দেয় — ভয় কি, আমি তো আছি, ভাল করে দেব, তখন একবার।

ঈশ্বরপুরুষ অবশ্য হাসেন মানুষের মূঢ়তা আর আসক্তি দেখে। সচেতন করেন তাদের সহজবোধ্য হাস্য রসে। সে হাস্যরসে থাকে প্রজ্ঞার গাম্ভীর্য। প্রকৃত সত্যের দীপ্তি আর জীবনের বাস্তবতা। তাঁদের কৌতুক মূঢ় মানুষের মানবিক ক্লৈবত্ব মোচনে। জীবনের প্রকৃত সত্যকে তাঁরা ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞার আলোয় যেভাবে দেখেন, বিষয়াসক্ত মূঢ় মানবমনকে জাগ্রত করেন তাঁরা কৌতুকের কষাঘাতে। স্ফটিকস্বচ্ছ দুরন্ত হাস্যরসের স্নিগ্ধ স্রোতে। তাঁদের জীবনলীলার নিত্যসঙ্গী। ঈশ্বরপুরুষদের সেই রঙ্গরসিকতাকে নিয়ে এই প্রতিবেদন।

ঈশ্বর পুরুষের রঙ্গরস

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজীকে সারা বিশ্ব জানে মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহাত্যাগী ও মহান দেশপ্রেমিক রূপে। বলা হয় তাঁকে স্বদেশ মন্ত্রের দীক্ষাগুরু। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। সেই মান হুঁসে গড়া স্বামী বিবেকানন্দ কেমন মানুষ ছিলেন, তা জানে ক'জন? সেই 'কেমন' কথাটা ফুটে ওঠে তাঁর বন্ধু ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণায়। কেদারনাথের কথানুযায়ী স্বামীজী ছিলেন যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবক্তা। কেউ তাঁকে দেখলে বা কথা শুনলে মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না। তাঁর রহস্যমাখা ভাষা বা বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা ছিল শোনার জিনিস। সবই সদর্থপূর্ণ ও দরকারি। সমঝদার শ্রোতা হলে শুনে অবাক হয়ে ভাবতেন বয়সের অনুপাতে এত জ্ঞান হয় কী করে। যা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদেরও চমকে দেওয়ার মতো। সেসব কিন্তু হাসি রহস্যের মোড়কে পরিবেশিত হত। তারই কয়েকটা শোনান যাক।

১৮৯২ সালের অক্টোবরে স্বামীজী আতিথ্য নিয়েছেন বেলগাঁও (কর্ণাটক) নিবাসী ভক্ত শিষ্য হরিদাস মিত্রের গৃহে। প্রতিদিন সেখানে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। একদিন বিশ্বের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন — আপন আপন মত বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা জেদ দেখা যায়। ধর্মমতের বেলায় এর বিশেষ প্রকাশ। একটি গল্প শোনাই। একবার একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয়ের জন্য অন্য রাজা সেখানে হানা দিল। শত্রুকে কী করে প্রতিহত করা যায় তা নিয়ে রাজা সভা ডাকলেন। সভায় সূত্রধর, ইঞ্জিনিয়ার, কর্মকার, চর্মকার, উকিল, পুরোহিত সকলে ছিল। ইঞ্জিনীয়ার বললেন, মহারাজ, নগরীর চারধারে চওড়া খাল খনন করা হোক। সূত্রধর বললে — তাঁর থেকে রাজ্যের চারধারে কাঠের দেওয়াল তোলা যাক। চর্মকার বললে চামড়ার বেড়া দেওয়া হোক। কামার বললে সবচেয়ে ভাল হয় লোহার প্রাচীর দিলে।

বৈদেহীনন্দন রায়

তাতে গোলাগুলি আটকাবে। উকিল বললে, কিছু করার দরকার নেই। শত্রুদের যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝান যাক্, আমাদের রাজ্য তারা দখল করতে পারে না। পুরোহিত বললে শেষে — তোমরা পাগল হয়েছো। প্রলাপ বকছো, হোমযাগ কর, স্বস্তয়ন কর, তুলসী দাও। এতেই শত্রুরা প্রতিহত হবে। এইভাবে রাজ্য বাঁচাবার কোনও উপায় স্থির না করে, নিজ নিজ মত নিয়ে মহা হুলস্থুল কান্ড জুড়ে দিল।

স্বামীজী হেসে বললেন, জানবে এটাই মানুষের স্বভাব। ধর্মমতের ক্ষেত্রে যা আলাদা হবার নয়।

স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ছিলেন প্রিয়নাথ সিংহ। স্বামীজী মজা করে তাঁকে প্রিয় সিঙ্গি বলে ডাকতেন। একদিন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে কথপোকথনকালে প্রিয়নাথ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমেরিকায় যাঁরা তাঁর শিষ্য হয়েছেন, তাঁদের কেন প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিলেন। তাঁরা তো ম্লেচ্ছ। শূদ্রের যখন প্রণবে অধিকার নেই, তাঁদের তো কথাই নেই। স্বামীজী স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বললেন — আমি যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেরাই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই। হবার খুব সম্ভাবনা। না হতেও পারে। বাগবাজারে অঘোর চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে। মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ি নিয়ে যায়। সেও তো বলে আমি বামুনের ছেলে।

স্বামীজীর কথায় হাসির রোল।

অন্য আর একদিন। বলরাম বসুর বাড়িতে আবার আলোচনা সভা স্বামীজীর। প্রশ্ন কর্তা সেই প্রিয়নাথ — আমাদের দেশে অধ্যাপক ও কুলগুরুরা সেরকমভাবে কেন দীক্ষা-শিক্ষা দেন না। স্বামীজীর কণ্ঠে জেগে ওঠে ব্যঙ্গের দীপ্তি — গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন সেটা তার একটা ব্যবসা। আর গুরু শিষ্যের সম্বন্ধটা কেমন! ঠাকুর মহাশয়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নি বললে — ওগো, একবার শিষ্য বাড়ি-টাড়ি যাও, পাশা খেললে কি আর পেট চলে? ব্রাহ্মণ বললেন — হ্যাঁ গো কাল মনে করে দিও। অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনেছি। আর তার কাছে অনেকদিন যাওয়া হয়নি। এই তো বাংলার গুরু। প্রতিবছর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয় বেলুড় মঠে। বহু লোক স্টিমারে আসেন। স্টিমার মঠের কিনারায় লাগলে আর রক্ষে নেই। সকলে চায় আগে নামতে। ফেরার সময় সেই একই দৃশ্য। সকলে উঠতে চায় আগে। কে কার ঘাড়ে পড়ে ঠিক নেই। প্রতিবারই দু'একজন জলে পড়ে। এটা কি সভ্যতার অসম্পূর্ণতা — জিজ্ঞাসা করেন প্রিয়নাথ।

স্বামীজীর রসোদীপ্ত উত্তর — দেখ, আমরা পাঁচ সাতজন একত্র হলেই অসংযত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সকলেই একসঙ্গে কথা বলবে। কেউ কারো কথা শুনবে না। যদি গান আরম্ভ হল তো সকলেই ভাবে তাতে যোগ দিতে হবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত বিচার নেই। সুরে সুর মিলল না মিলল ভ্রূক্ষেপ নেই, লজ্জা নেই — যেন ভেড়ার খোঁয়াড়ে আগুন লেগেছে।

তথ্যসূত্র - স্মৃতির আলোয় স্বামীজী ও উদ্বোধন।

আয়ুর্বেদিক হৃদরোগ চিকিৎসা

রবীন সেনগুপ্ত

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী শরীরের প্রায় সমস্ত রোগই বাত পিত্ত আর কফ — এই তিন প্রকার বস্তুর মাত্রাগত পার্থক্যের জন্য সংঘটিত হয় বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া আছে। হৃদপিন্ড ঘটিত ব্যাধির ক্ষেত্রেও এই তিনটির প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। তার সাথে কৃমিজ ও সন্নিপাতজ কারণেও হৃদযন্ত্রের গোলযোগ দেখা দিতে পারে বলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকারগণ মন্তব্য করে গেছেন। শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় বাতাসের চাহিদা সবসময় আমরা পরিপূর্ণভাবে পাই না। প্রাণায়াম প্রাতঃভ্রমণ কিছু ব্যায়াম খেলা-ধূলার মাধ্যমে অনেকে এই অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা পূর্ণ করে নেন। তবে অনেকের পক্ষেই এগুলি করা সম্ভব হয় না। এর জন্য কারো কারো ক্ষেত্রে হার্টের ব্যাধি দেখা দিতে পারে। এটিকে বাতজ হৃদব্যাধির মধ্যে গণ্য করা হয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে। এই প্রসঙ্গে গরুড় পুরাণের ১৫৮ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে — বাতেন শূন্যতাত্যর্থং ভুজ্যতে রোদিতীতি চ। ভিদ্যতে শুষ্যতে স্তব্ধং হৃদয়ং শূন্যতা ভ্রমঃ। অর্থাৎ বাতজ হৃদরোগে হৃদয়ে শূন্যভাব এসে গ্রাস করে। কখনও রোদন বেদনা এসে উপস্থিত হয়। তাছাড়াও ভীতিভাব, শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা, শুষ্কতাবোধ এগুলিও যে এই ধরনের হৃদরোগের বৈশিষ্ট্য তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে।

পিত্তজ হৃদরোগে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক জলতেষ্টা, ঘাম, অম্ল, উদ্‌গার, হৃদযন্ত্রে ব্যথা, বমি ও জ্বর এই লক্ষণগুলি দেখা যায়।

কফজ হৃদরোগে হৃদয় স্তব্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, মুখবিকৃতি, কাশি, অস্থিবেদনা, কফ নিঃসরণ, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি ও জ্বর এই সকল উপসর্গ দেখা যায়।

সন্নিপাতিক হৃদরোগে পূর্বোক্ত তিন প্রকার লক্ষণের যে কোনও একটি দেখা দিতে পারে। ক্রিমিজ হৃদরোগে রোগী চোখে অন্ধকার দেখে, নেত্রদ্বয় পিঙ্গলাভ দেখায়, গাত্রকুন্ড, কফস্রাব ইত্যাদিও দেখা যায়।

পূর্বোক্ত গরুড় পুরাণের একই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে বলা হয়েছে — হৃদয়ং প্রততঞ্চ ায় একচেনেব দীর্ঘ্যতে। চিকিৎসেদামময়ং ঘোরং তচ্ছীঘ্রং শীঘ্রকারিনম্। অর্থাৎ হৃদরোগগ্রস্ত

রোগীর হৃদয় যেন মনে হয় করাত দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই রোগ রোগীকে দ্রুত বিনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। অতএব রোগের প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসা করা দরকার।

হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদের নানা গ্রন্থে একাধিক ঔষধের উল্লেখ আছে। তবে তার সাথে আহারশুদ্ধি, যোগাসন, প্রাণায়াম ইত্যাদিকে এই রোগ দ্রুত নিরাময় বা চিরকালের জন্য আটকে রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত আধুনিক চিকিৎসকরা মেনে নিয়েছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারও করতে শুরু করেছেন। সরবিট্রেট জাতীয় ওষুধ নিয়মিত গ্রহণের সাথে সাথে প্রায় সমস্ত রোগীই এখন প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরার অনবদ্য সম্ভার যোগবিজ্ঞানকে গ্রহণ করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন দেখে আমরা যার পর নাই সাফল্য সুখ অনুভব করতে পারছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাথমিক প্রভাবে মানুষের মনে প্রাচীন চিকিৎসা সম্পর্কে একটা চরম তাচ্ছিল্যের ভাব এসে পড়েছিল। কিন্তু বেদবিদদের নিরলস প্রচার ও প্রয়াসের ফলে আজ আবার ভারতীয় পরম্পরার সমাদর ফিরে এসেছে।

গরুড় পুরাণের পূর্বখন্ডের ১৮১ অধ্যায়ের ৩৮ তম শ্লোকে হৃদরোগের একটি ঔষধ তৈরির সূত্র রয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে "মধবাজ্যপিপ্পলীচূর্ণং ক্বথিতং ক্ষীরসংযুতম্, পীতং হৃদ্রোগ বিষমজ্বরনুদ্ভবেৎ," এর অর্থ হল, মধু ঘৃত পিপ্পলীচূর্ণ ও দুগ্ধ— এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে পাক করে সেই ক্বাথ পান করলে হৃৎরোগ, কাম ও বিষম জ্বর নাশ পায়।

এই গ্রন্থটিরই ১৮৮ অধ্যায়ের ৪২ তম শ্লোকটিতে হৃদব্যাধির নিরাময়ের জন্য আর একটি সূত্র রয়েছে। সূত্রটি এইরূপ — শুন্টিং সৌবচ্চলং হিঙ্গুং পীত্বা হৃদয়রোগণুৎ। অর্থাৎ শুন্টি, সৌর্বচ্চল ও হিঙ্গু এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ হৃদরোগ নির্মূলে সহায়তা করে। এটি যেহেতু সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ তাই এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করার সুযোগ আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না। পাঠককে এই সব বিষয়ে প্রাথমিক একটা ধারণা দেওয়ার জন্যই এই জাতীয় রচনার অবতারণা। না হলে এমনিতে যেকোনও ব্যাধির আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় হয়ে যাবে।

যেসকল যোগাসনকে সাধারণত হৃদরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার নির্দেশ হঠ যোগীরা প্রদান করে গেছেন তার মধ্যে রয়েছে সহজ বস্তিক্রিয়া, যোগমুদ্রা ৬ বার, সহজ বিপরীত করণ ৩ মিনিট, পবনমুক্তাসন চার বার, সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ প্রাণায়াম। এইগুলি কখন কীভাবে করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনার জন্য গ্রন্থ রয়েছে, শিক্ষকও রয়েছেন। হৃদরোগাক্রান্ত অবস্থায় শবাসনে সীমিত পরিমাণে দুধ ও ফল গ্রহণ, তেল ঘৃত মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে এসবের নির্দেশও প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসকরাও এগুলিকে সসম্মানে গ্রহণ করেছেন। হৃদরোগের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে দূষয়িত্বারসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গীতা। হৃদি বাধা "প্রকুর্বন্তি হৃদরোগঃ তং প্রচক্ষতে," এর অর্থ হল রক্তরসে দোষ সৃষ্টি হলে তা হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করে হৃদক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে — এরই নাম হৃৎরোগ। রক্তরসে সবচেয়ে অধিক ক্ষেত্রে যে দোষটির জন্য হৃদযন্ত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা হল কোলেসটেরল। অতিরিক্ত প্রোটীন ও চর্বি জাতীয় খাদ্য যথা রেড মিট, ডিম, তেলেভাজা ইত্যাদি গ্রহণ করলে রক্তে কোলেসটেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আমেরিকান চিকিৎসক ডেভিড মুর জানিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদবিদগণ গুগগুলের আঠা দিয়ে কোলেসটেরল নিয়ন্ত্রণ করার ঔষধ তৈরি করতে জানতেন।

এইরকম বিভিন্ন ধরনের তথ্য আমরা নিয়মিত চর্চার ফলে সংগ্রহ করতে পারছি। যা আগামী দিনে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

মাতৃভক্ত

পোস্টম্যান দরজার কড়াটা বার তিনেক নাড়া দিলেন। দরজা খুলতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বয়স্কা মহিলা। পোস্টম্যান হাতের রেজিস্ট্রি চিঠিটা তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। চশমার কাঁচ দুটো ভালো করে মুছে বৃদ্ধা চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন। মুম্বাই থেকে ছেলে এতপ্পা মা'কে চিঠিটা পাঠিয়েছে। এতপ্পা এখন মুম্বাই-এ । ছোটবেলাতেই পড়াশোনার উদ্দেশ্যে মুম্বাই আসে সে। তখন পথ-ঘাট তেমন চিনতো না। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা বোঝার বোধ শক্তিও হয়নি। তা অনেক বছর হয়ে গেল। এতপ্পা এখন বড় ব্যবসায়ী। ধনী।

ছোটোবেলা থেকেই বাইরে পড়ার স্বপ্ন দেখত সে। বাবা অনেক আগে মারা গেছেন। নিজের বলতে কেবল মা। মা উপার্জন করে সংসার চালান। বাইরে পড়াবার খরচ যোগাড় কঠিন ভেবেই, এতপ্পা কখনও সেকথা মা'কে মুখ ফুটে বলেনি। একটু বড় হয়ে যখন নিজের খরচ চালানোর মতো বড় হয়েছে, তখনই বাইরে যাওয়ার কথা মা'কে সে বলেছে। মা'র অনুমতি নিয়ে এতপ্পা পাড়ি দেয় মুম্বাই। বাইরে থেকে লেখাপড়ার খরচ অনেক। তাই বলে সে মাকে চাপ দেয়নি। নিজের খরচ নিজে যাতে চালাতে পারে, সে ব্যবস্থাও সে নিজেই করেছে।

লেখাপড়ার খরচ চালাতে এক হোটেলে কাজ ধরল। দিনে হোটেলে থালা-বাসন ধোয়ার কাজ। আর রাতে পড়াশোনা। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করত এতপ্পা। সে জানে তাকে বড় হতে হবে। কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে না। এইবোধ ছোট্ট এতপ্পার মধ্যেও এসে গিয়েছিল। স্কুলেও ভর্তি হল সে। দিনে কাজ, রাতে লেখাপড়া। দুই সমানতালে চালিয়ে যেতে লাগল এতপ্পা। উপার্জিত টাকা মা'র কাছেও পাঠাতে শুরু করল। লেখাপড়ার ব্যাপারটা যখন একটু এগিয়েছে, এতপ্পা তখন হোটেলের কাজ ছেড়ে দিল। পেয়ে গেল ক্লার্ক-এর কাজ। এক হোটেলে ক্লার্কের পদে চাকরি। আগের থেকে একটু

সতীনাথ রায়

বেশি টাকার মুখ দেখতে লাগল। মা'র কাছেও আগের থেকে বেশি টাকা পাঠাতে শুরু করল। এতপ্পা ভাবল, এইভাবে জীবন-যাপন করলে হবে না। কতদিন পরের কাজ করব— এই ভাবনাটা তাকে ভাবাতে লাগল। নিজে কিছু করতে পারলে তার থেকে ভালো আর কী হতে পারে — এতপ্পার মাথায় এই চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। একদিন গভীর রাতে এতপ্পা হোটেল খোলার কথা মনে মনে ঠিক করে ফেলল। সে নিজেও এলাইনে আছে অনেকদিন। দীর্ঘদিন এই লাইনে থাকায় হোটেল ব্যাবসায়ের ভালোমন্দও তার জানা। কর্ম ব্যস্ত মুম্বাই-এ এতপ্পার হোটেল চালু হল। বিক্রিবাট্টাও কম হল না। দেখতে দেখতে বেশ নাম-ডাক হল তার। তবে এতসবের পরও এতপ্পার ভিতরটা সেই আগের মতোই রয়ে গেছে। মাকে টাকা পাঠানো। মন খারাপ লাগলে বাড়ি যাওয়া — এই সব তার আগের মতোই ছিল। এদিকে এতপ্পা আরও একটা হোটেল খুলল। দুটো হোটেলই সমানতালে চলতে লাগল। অর্থের আর অভাব হল না তার।

তখন বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় মিষ্টি বাতাস বইতে শুরু করেছে। এতপ্পা অনেকদিন পর গ্রামের বাড়ি (কর্ণাটক) এসেছে। মার কোলে মাথা দিয়ে গল্প করছিল। দেখতে দেখতে এতপ্পা আজ কতটা বড়। মা ছেলে দুজনেই অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত। কথার মাঝে এতপ্পা তার মাকে জিজ্ঞেস করল, মা তোমার আর কী চাই? উত্তরে মা বললেন — বাবা, ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের তো সবই হয়েছে। আর কী চাই। তবে তোর মতো যাতে সবাই লেখাপড়া করে, বড় হয় তার ব্যবস্থা একটা করিস। পারলে গ্রামে একটা বিদ্যালয় খোল। সবাই তাহলে লেখাপড়া শিখতে পারবে। মার কথাটা ভালোই লাগল এতপ্পার। সবাই যাতে বিনা খরচে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য স্কুলও খুলল এতপ্পা। আজ অনেক এতপ্পা গ্রামের এই স্কুলে পড়ছে। তারাও এতপ্পার মতো বড় হচ্ছে।

দক্ষিণ কর্ণাটকের এই ঘটনা সত্য। এখনও বিদ্যালয়টিতে কোনও মাইনে লাগে না।

ত্রিপুরার সন্ত

শ্রীমৎ স্বামী জগদ্বন্ধু গোস্বামী

ব্রজভূমিতে, বৃন্দাবনে, নন্দগ্রামে শ্রীমৎ স্বামী জগবন্ধু গোস্বামী মোহান্ত মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। মাঘ মাসে শুক্লা প্রতিপদে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর আয়ুষ্কাল হবে আনুমানিক ১৮৭৪ খৃঃ থেকে ১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত।

বাল্যকালে তিনি রামপন্থী সাধুদের সম্মেলনে কৌতূহলবশতঃ গিয়েছিলেন। সম্মেলন হয়েছিল নন্দগ্রামে। সেখানে এক সাধু সুলক্ষণযুক্ত বালকটিকে দেখে আদর করে 'বালক ভগবান' বলে কোলে তুলে নিলেন। এইভাবেই সাধুসঙ্গ ভাল লাগল। তিনি ওই সাধুর সঙ্গেই চলে গেলেন। বেশ কয়েক বৎসর ওই সাধুর সঙ্গে ভারতের অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্র দর্শন করলেন। সাধন-ভজন পদ্ধতি শিক্ষালাভ করলেন। রামের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দৃঢ়বদ্ধ করলেন।

নানা তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে, তিনি পূর্ববঙ্গে এলেন। পশ্চিমে মেঘনা এবং পূর্বে তিতাস এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক স্থানে একটি প্রাচীন দেবালয় বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটেই, পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাচীন দেশীয় হিন্দু রাজ্য। এখানে প্রতি বৎসর শীতকালে বহু সাধুসন্তদের শুভাগমন ঘটত। রাজার কড়া নির্দেশ ছিল, যাতে মহাত্মারা আদর যত্ন পান। দান দেবার্চন বিভাগ সাধুদের থাকার খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করত। এই ভাবেই জগদ্বন্ধু গোস্বামী একবার আগরতলায় আসেন। এখানকার আদরযত্ন পেয়ে তাঁর ইচ্ছা হল কিছুদিন এখানে সাধন ভজন করার।

জগদ্বন্ধু গোস্বামী এই স্থানটি পছন্দ করলেন। গাছতলে বসে তিনি ধুনি জ্বালিয়ে কেবলই রামনাম করতেন। রাজার লোক এসে লকড়ি কেটে দিত, খাবার দিয়ে যেত। রাজার ইচ্ছা ছিল সেখানেই, হাওড়া নদীর তীরে একটি আশ্রম করে দিতে। সাধু রাজী হলেন না। অন্যত্র চলে যাওয়ার আগে রাজাকে জানালেন, এবং অনুরোধ করে গেলেন সেই ধুনি যেন অক্ষয় রাখা হয়। প্রায়

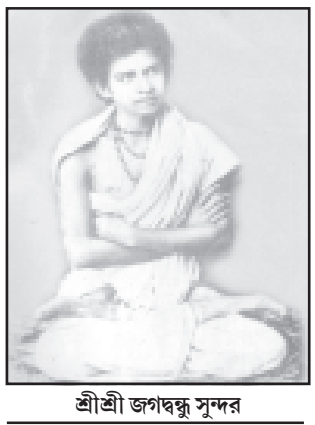

শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দর

শতবর্ষব্যাপী সেই ধুনি অক্ষয়, অনির্বাণ আছে, পাকা দেবালয় করা হয়েছে, হনুমান বিগ্রহ পূজিত হন।

ত্রিপুরা থেকে তিনি গেলেন পশ্চিমবঙ্গে , আলমডাঙ্গা নামক স্থানে। সেখানেও রঘুনাথজীউর আশ্রম আছে। এছাড়া, ২৪ পরগণার হালিশহরে, নদীয়ার বগুলা নামক স্থানে রঘুনাথের আশ্রম আছে। এই সব আশ্রমের স্থাপয়িতা কে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে এসব আশ্রমে তিনি মোহান্ত পদে ছিলেন।

জগবন্ধু গোস্বামী অসমে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ভক্ত ও শিষ্য কয়েকজন ছিল। অসম থেকে তিনি আবার আসেন আগরতলাতে মেলার মাঠে পোদ্দার বাড়িতে গোবিন্দ বাবু, রাজেন্দ্র বাবু, লব বাবু ও কুশ বাবু ছিলেন তাঁর শিষ্য। সেই বাড়িতে সাত মাস থাকেন। অতঃপর বগুলাতে চলে যান। বগুলাতে তখন ছিল শিষ্যা অন্নপূর্ণা দেবী। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকায়, শিষ্যা অপত্যস্নেহবশতঃ রাগারাগি করেন। গুরুদেব আনন্দিত চিত্তে শিষ্যার আবদার মেনে নিলেন এবং কয়েকদিন পর বললেন, আগরতলার ভক্তদের ঐকান্তিক আগ্রহ। আগরতলাতে একটি আশ্রম স্থাপন করতে ভক্তরা সম্পত্তি দিয়েছেন। গুরুদেবের ইচ্ছা, অন্নপূর্ণা দেবী যেন আগরতলাতে গিয়ে আশ্রম স্থাপনের কাজে সহায়তা করেন।

১৩৬৮ বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে ১৯৬১ ইং) গুরু ও শিষ্যা এলেন আগরতলাতে। আগরতলার অখিল ঘোষ এবং সুকুমার পাল গেলেন আগরতলা বিমানবন্দরে গুরুদেবকে আনতে। অখিলবাবুর বাড়ি ছিল হাওড়া নদীর দক্ষিণ তীরে। আগের দিন ঝড়-তুফানে হাওড়া নদীর উপরে তৈরি বাঁশের-কাঠের কাঁচা সেতু ভেঙ্গে গেল। তাই জগহরিমুড়াতে সুকুমার বাবুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হল। এখানে প্রায় এক বৎসর থাকলেন। সুকুমার পাল কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিতেই আশ্রম গড়ার সিদ্ধান্ত হল। আশ্রমের কাজ চালু করে, অন্নপূর্ণাকে কাজের ভার দিয়ে গুরুদেব চলে গেলেন বগুলাতে। কয়েক বৎসর পরে তিনি মারা যান। তাঁর তিরোভাব হল ১৫ বৈশাখ ১৩৭১ বঙ্গাব্দে (১৯৬৪খৃঃ)।

জীবনে বিজ্ঞান

স্টেম সেলের নতুন ঝলক

বিজ্ঞানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। একথা প্রমাণ করলেন জাপানের ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব এ্যাডভান্সড্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা। একটি দশ বছরের মেয়ের আক্কেল দাঁত থেকে টিসু বের করে তা থেকে স্টেম সেল তৈরি করেছেন। স্টেম সেল গবেষণা চিকিৎসার সম্ভাবনাকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে, সম্ভব করেছে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা।

পোস্তর বীজ থেকে ভোজ্য তেল

জেনেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আফিংও বদলে যাচ্ছে। পোস্তর বীজ থেকে তৈরি হয় নেশার বস্তু আফিং। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জিন-প্রযুক্তির সাহায্যে এমন পোস্ত গাছ সৃষ্টি করেছেন, যার আফিং খেলেও নেশা হবে না। 'সুজাতা' নামের এই পোস্ত গাছের মধ্যে থেকে কৃত্রিম উপায়ে বের করে নেওয়া হয়েছে মাদক ধর্মের জন্যে দায়ী জিনটি। লখনউয়ের সেন্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউট অব মেডিসিনাল অ্যান্ড অ্যারোম্যাটিক প্লান্টস্-এর বিজ্ঞানী জে আর শর্মার ৮ বছরের গবেষণার ফল এই মাদকহীন পোস্তর বীজ। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাই বিশ্বে প্রথম। শুধু মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবেই নয়, সুজাতা পোস্ত বীজ কোলেস্টেরল মুক্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ সুষম এক ভোজ্য তেলেরও জোগান দেবে।

মাতৃঋণ

ক্যান্সারে ভুগছিলেন গর্ভবতী মিশেল স্টেপ্‌নি। গর্ভপাতের পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। রাজি হননি। অশেষ যন্ত্রণা সয়ে অবশেষে জন্ম দিয়েছেন নাদুসনুদুস দু'টি কন্যা। দুনিয়ার আলো দেখার তাগিদে গর্ভে তারা যে-ধাক্কা দিত, তাতেই নিষ্ক্রান্ত হয়েছে মায়ের ক্যান্সারদুষ্ট টিউমার। মাকে মারণ রোগ থেকে বাঁচাল ওই যমজ কন্যা। চমৎকৃত লন্ডনের চিকিৎসকেরা মিশেলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন।

খাঁটি গয়নার জন্য

গয়না গড়িয়ে মাত্র ১০ সেকেন্ডের মধ্যে জেনে নেওয়া যাবে তৈরি অলঙ্কারে কতটা খাঁটি সোনা আর কতটা খাদ মেশানো আছে। এর জন্য মার্কিন মুলুক থেকে এসে গেছে 'ইনোভা এক্স সিস্টেম' নামে একটি যন্ত্র। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এই যন্ত্রের সাহায্যে শুধু সোনাই নয়, যে কোনও ধাতু বা ধাতু নির্মিত বস্তু না গলিয়েই বলে দেওয়া যাবে তার মধ্যে কতটা পরিমাণে কোন্ ধাতু আছে।

সঙ্গীতে রোগ নিরাময়

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শব্দ মানুষের নানা রোগের সম্ভাবনা কমাতে পারে। একথা জানিয়েছেন পাকিস্তানের বিজ্ঞানী ডাঃ এ জববার খান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মানুষের শরীরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রচিত। বিশেষত রাগপ্রধান গানগুলি নির্দিষ্ট সময় এবং সিজন অনুযায়ী গাওয়া হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীত শরীরে কোনও স্পন্দন জাগায় না। কারণ, এগুলি কোনও নির্দিষ্ট সময়ে গাওয়া হয় না। ডাঃ খান জানিয়েছেন, বায়োরিদম্ তত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের আচার-আচারণ প্রভাবিত হয় দৈহিক ভাবাবেগ এবং মানসিক উৎকর্ষতা দিয়ে। বর্তমানে আলট্রা সাউন্ড টেকনিক মানুষের শরীরের পাথর গলাতে সাহায্য করে।

প্লাস্টিকে সাবধান

প্লাস্টিক ব্যবহার মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে। প্লাস্টিক জিনিসপত্রে ব্যবহৃত 'বিসফেনোল এ' নামে রাসায়নিক যৌগটি নষ্ট করতে পারে স্মৃতি, শেখার ক্ষমতা। রাসায়নিকটি অ্যালঝাইমারস স্কিৎজো ফ্রেনিয়া, অবসাদের কারণও হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন কানাডার গেল্‌ফ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা। সাধারণ প্লাস্টিক পাত্রে খাবার রাখলে তাতে চুঁইয়ে ঢুকতে পারে 'বিসফেনোল এ', সেখান থেকেই প্রবেশ করে মানুষের শরীরে।

— নির্মল কর

এক রাজনৈতিক দলিল

(৯ পাতার পর)

পরিসংখ্যান ও তথ্যের জন্য বইটি আকর গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

সংকলিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি লেখকের সহজাত অনুসন্ধিৎসা, সংবেদনশীলতা এবং মানবিক যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের পরিচয় বহন করে। সর্বোপরি প্রচলিত চিন্তাধারার বিপরীত ভাবনা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করার মধ্যে লেখকের মনের বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলিত পদার্থবিদ্যার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এবং সুলেখক ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী'র সম্পাদনায় বইটি পাঠকের কাছে আদৃত হবে। একই সাথে সুস্থ চিন্তার উদ্রেক ঘটাবে আশা করা যায়। তাই এ ধরনের বই এর বহুল প্রচার কাম্য।

প্রবন্ধগুলির রচনাকাল উল্লেখ থাকলে ভাল হতো, যদিও ঘটনাগুলির সংঘটনকাল থেকে একটা পরোক্ষ আন্দাজ পাওয়া যায়। বইটি কোথায় ছাপা হয়েছে তার উল্লেখ চিহ্নিত স্থানে থাকলেই হতো। কিছু মুদ্রণ প্রমাদ আছে, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে আশা রইল।

'মানবতারশত্রুইসলাম', রবীন্দ্রনাথ দত্ত।
ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী দ্বারা সম্পাদিত।
প্রকাশক - সেভ ইন্ডিয়া মিশন,
বি ই ৩০০, সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা-৭০০ ০৬৪
মূল্য - ১২ টাকা মাত্র।

মাওবাদী পুরোহিত নিয়োগ করে ইতিহাসকে নতুন করে লেখার চেষ্টা নেপালে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নেপালে ক্ষমতাসীন মাওবাদীরা এবার তালা ভেঙে দখল নিল পশুপতিনাথ মন্দিরের। গায়ের জোরে মন্দিরের শতশত বছরের ঐতিহ্যকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বদলে নিযুক্ত করল মাওবাদী পুরোহিত। আরও একবার নেপালের এই ঘটনা প্রমাণ করল যে পৃথিবীর কোনও দেশেই কমিউনিস্ট শাসকরা আইন-আদালত, ঐতিহ্য, দেবমন্দির, ধর্ম কোনও কিছুই মানে না, মেনে চলে না। গত ১ জানুয়ারি নেপালে ক্ষমতাসীন মাওবাদীদের যুবশাখা ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের স্বেচ্ছাসেবক এবং সি পি এন (মাওয়িস্ট-লেনিনিস্ট)-এর ক্যাডাররা তাদের মনোনীত পুরোহিত বিষ্ণুপ্রসাদ দহলকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে। প্রসিদ্ধ পশুপতিনাথ মন্দিরের মূল ফটকে পৌঁছেই তাঁরা প্রধান দরজার তালা ভাঙ্গে। তারপর মূল মন্দিরে ঢুকে ভারতীয় পুরোহিতকে বের করে দেয়। নিজেদের পছন্দের বিষ্ণুপ্রসাদ দহল-কে পুরোহিত পদে বসিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে নেপালের সর্বোচ্চ আদালত স্থগিতাদেশ দিলেও নেপালী মাওবাদীরা তা মানেনি। এই ঘটনা আরও একবার দেখিয়ে দিল যে ভগবান পশুপতিনাথ মন্দিরের পুরোহিত বদলের নামে নেপালের ইতিহাসকে নতুন করে লেখার চেষ্টা করছে মাওবাদীরা।

এই প্রথম ৩০০ বছরের প্রথা-ঐতিহ্য বিলুপ্ত হল। ছেদ পড়ল নিত্য পূজাতে। তাও পরপর দু'দিন ধরে। সরকার সরাসরি মন্দিরের ভিতরে হস্তক্ষেপ করল।

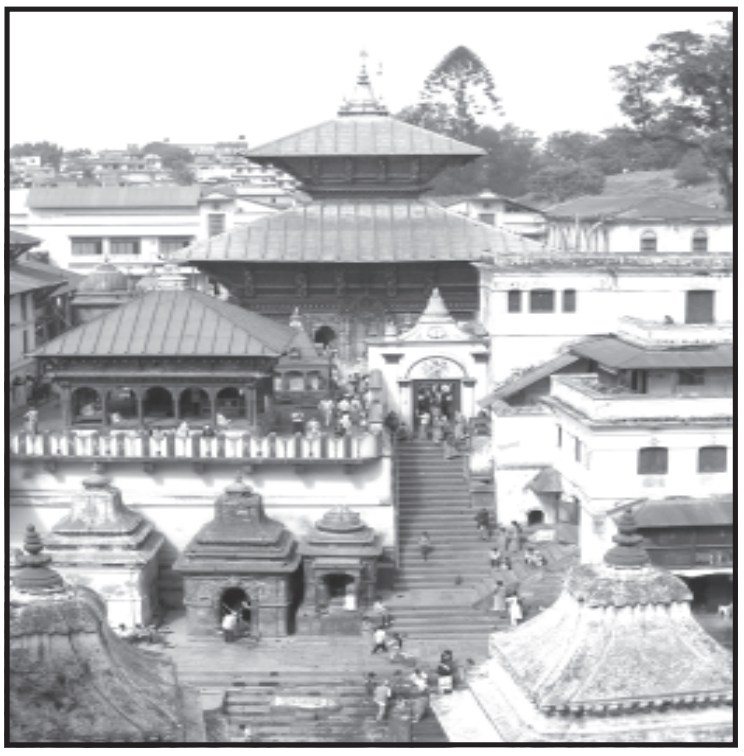

পশুপতিনাথ মন্দির এলাকা উন্নয়ণ পর্ষদের প্রাক্তন প্রধান নরোত্তম বৈদ্য জানিয়েছেন, এই প্রথম ৩০০ বছরের প্রথা-ঐতিহ্য বিলুপ্ত হল। ছেদ পড়ল নিত্য পূজাতে। তাও পরপর দু'দিন ধরে। সরকার সরাসরি মন্দিরের ভিতরে হস্তক্ষেপ করল। বৈদ্যজী আরও জানিয়েছেন, শতাব্দী প্রাচীন রীতি-নীতি মেনেই পশুপতিনাথের মন্দিরে পূজার্চনা হয়। কিন্তু পরপর দু'দিনই নিত্যপূজাও বিক্ষোভ-এর জেরে তা হতে পারেনি। ওই মন্দির এলাকার বাসিন্দা ৭২ বছরের রামপ্রসাদ অধিকারী জানিয়েছেন, যে প্রথা ২৬১ বছর আগে রাজা ভূপেন্দ্রমল্লর আমলে চালু হয়েছিল তাতে বিঘ্ন ও ছেদ ঘটল। শ্রীঅধিকারী গত ৬০ বছর ধরে মন্দিরের নিত্যপূজা দেখে আসছেন। তাঁর মতে এই ঘটনায় নেপাল থেকে ভারতে ভুল সঙ্কেত পাঠানো হল। ভারতেও অনেক মন্দিরে নেপালী ব্রাহ্মণরা পুরোহিতের কাজ করছেন। এছাড়া নিত্য পূজা ব্যাহত হওয়াটা নেপালের পক্ষে একান্তই অশুভ। আসলে মন্দিরের পুরোহিত বদলের নামে ভারতের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে মাওবাদীরা। নেপালের প্রধান আদালতের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে তিনশ বছর যাবৎ বংশপরম্পরায় মন্দিরে নিত্যপূজায়রত তিনজন ভারতীয় পুরোহিতকে নেপালের মাওবাদীরা বরখাস্ত করল। তাদের স্থানে নেপালী পুরোহিত নিয়োগ করল।

পৃথিবী জুড়ে মন্দির মন্দিরে পূজার্চনা ভারতীয় হিন্দু পুরোহিতরাই করে থাকেন। নতুন পুরোহিত নিয়োগে বিভিন্ন হিন্দু সংস্থা প্রতিবাদ জানিয়েছে। নতুন পুরোহিতদের যাতে কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয় সেজন্য মাওবাদী সরকার মন্দিরে ব্যাপক সংখ্যায় রায়ট-পুলিশ নিয়োগ করেছে। আদালতে আপত্তি জানিয়েছে স্থানীয় ভাণ্ডারী সম্প্রদায় এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজ। তাদের কথায় — এভাবে জোর করে ৩০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য পরম্পরাকে ভেঙে ফেলা যায় না। ওদিকে নেপালী সংসদে মূল বিরোধী দল নেপালী কংগ্রেসও এই বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। স্থানীয় ভাণ্ডারীরা পশুপতিনাথ মন্দির এলাকা উন্নয়ণ পর্ষদের কর্ম-কর্তাদের হাতে আদালতের নির্দেশনামা তুলে দেবেন বলে জানিয়েছেন। ভারতীয় পুরোহিতদের পুনর্বহাল করাই তাদের দাবি। শেষ খবর হল, প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে নেপাল সরকার হিন্দু পুরোহিতদের পুনর্বহাল করার কথা ঘোষণা করেছে।

আগরতলায় সঙ্ঘের শীত শিবির

সংবাদদাতা ।। ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আগরতলা বিভাগের কার্যকর্তাদের শীত শিবির আগামী ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই শিবিরে অসম ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক ডঃ কৃষ্ণগোপাল এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রাক্তন প্রান্ত সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন।

শোক সংবাদ

গত ৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতার টালিগঞ্জ শাখার সর্বজন পরিচিত স্বয়ংসেবক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে রাঙ্গাদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর।

দক্ষিণ কলকাতায় সঙ্ঘের এক আদর্শ মুখ্যশিক্ষক হিসাবে তার সুনাম ছিল। তিন বৎসর টালিগঞ্জ সায়ম্ শাখার মুখ্যশিক্ষক থাকাকালীন এক দিনের জন্যও শাখায় অনুপস্থিত হননি। সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি কেন্দ্র সরকারের শিল্প শিক্ষা বিভাগে জয়েন্ট ডিরেক্টর ছিলেন।

তিনি স্বস্তিকার প্রকাশক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ ভ্রাতা। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনী এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন।

ভারত রক্ষা

(১০ পাতার পর)

ভারতের সর্বত্র একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। একটি উগ্রপন্থী দলের কার্যকলাপ যখন আমাদের গোয়েন্দাদের হাতে এসে পৌঁছায় বা জানতে পারে, তার পরেই এই সমস্ত উগ্রপন্থীরা Plan Programme পরিবর্তন করে। গত ২৬।১১।২০০৮ তারিখ থেকে যে ঘটনা মুম্বাই-এ ঘটে গেল যার নাম "মুম্বাই ম্যাসাকার" তা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। মুম্বাই ম্যাসাকারে পাকিস্তানের পূর্ণ মদত ছিল। পুলিশ তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই উগ্রপন্থীদের গতিবিধি ও কার্যকলাপ থেকে বিরত করতে সক্ষম হবে না। সম্ভব তখনই হবে, যদি ভারতের জনগণ, আমরা সবাই মিলিতভাবে মনে করি যে ভারতবর্ষ আমার মাতৃভূমি, আমি ভারতের, ভারত আমার, রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম জাগ্রত না হলে, দুস্কৃতীরা একাজ করতেই থাকবে।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতায় উজ্জ্বল গ্রন্থ

(৯ পাতার পর)

করলেন তখন অনেক মতই এসেছিল। হিন্দু সমাজ সমন্বয়, হিন্দু সমাজ সংস্কার, হিন্দু সমাজ সংগঠন ইত্যাদি নাম দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি লক্ষ্য ও বাস্তবায়নের মধ্যে যে সুন্দর সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। অর্থাৎ আজকের যুগে একদিকে যেমন সংগঠন প্রয়োজন, অন্যদিকে হিন্দুত্বের বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণও দরকার। অপরদিকে এগুলোর বাস্তবরোচিত অনুশীলন যার মধ্য থেকে ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বয় হবে এবং এরই ভিত্তিতে ব্যষ্টি সমষ্টির উত্তরণের স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। এই মহান ভাবনাকে সরল সদর্থক রূপে প্রকাশ তথা বিকাশ করতেই তিনি তৎকালীন পন্ডিত অধ্যাপক কুমুদবন্ধু সেনকে বলেছিলেন, "আমাদের হিন্দুর পালা-পার্বন উৎসবগুলিকে সজীব করিতে পারিলে এই শক্তি জাগিয়া উঠিবে। ব্যষ্টিগত উপাসনা সমষ্টিগত করিতে হইবে। ধর্ম মানে যা ধারণ করিয়া রাখিতে পারে — সে ধারণ করিবার শক্তিই ধর্ম। জীবনকে সংযত ও সুসংহত করিতে হইলে শক্তিরই আশ্রয় লইতে হয়। যে শক্তি সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীকে সংযত ও সুসংহতভাবে ধারণ করিবে — সেই শক্তিই সমাজ ধর্ম।"

আর এই সমস্ত কিছুরই প্রাসঙ্গিকতাকে সুন্দরভাবে সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্কের মতো উপস্থাপন করেছেন স্বামী যুক্তানন্দ তাঁর 'হিন্দু মিলন মন্দির' নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থে।

এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধেয় যুক্তানন্দজীকেধন্যবাদ দিয়ে যাওয়া ধৃষ্টতারই নামান্তর কেননা, তাঁর জীবনই এ পথের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে প্রবহোমান। তবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন বিশেষ করে আজকের পরিস্থিতিতে, এই জটিল আবর্ত থেকে উত্তরণের জন্য সঠিক দিশা দর্শনে এ গ্রন্থ এক অনবদ্য সংস্করণ। আগামী দিনে এরই পরবর্তী সংস্করণ হিসাবে আরও বিস্তৃত করে হিন্দুধর্মের পালা-পার্বনের বিজ্ঞানভিত্তিক দিকগুলি তুলে ধরে, সমাজকে আরও সুষ্ঠভাবে পথপ্রদর্শন করবেন এবং এই রকম গুহ্য তত্ত্বকে আধুনিকতার ভ্রান্তি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে উপস্থাপন করবেন এই আশা রাখি।

হিন্দু মিলন মন্দির
লেখক : স্বামী যুক্তানন্দ
প্রকাশক : ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, কল-১৯
দাম ১৫ টাকা

মুম্বই হামলার তদন্তে

(৭ পাতার পর)

কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে ছিলেন। যদিও সর্বাধিক সমালোচনার শিকার পুলিশ কমিশনার গফুর, যে কিনা আমে দুধে মিশে যাওয়ার মতো পাওয়ার ও কারাগাঁওকারদের সাথে সশস্ত্র পুলিশের আসার অপেক্ষায় বসেছিলেন। এমনকী আই পি এস অফিসারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়তেও চাননি। এই ঘটনার পরেও গফুর আরও ন্যক্কারজনক কাজকে প্রশ্রয় দিয়েছে এফ বি আই কে যথাযথ প্রমাণ না দেখিয়ে। যেমন, জি পি এস ডাটা, স্যাট ফোনের কপি'র মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না পরিবেশন করে। এরকমটাই মনে করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সর্ষের ভেতর ভূত বেশি দিন থাকলে, সে ভূত মাথায় চড়বে। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের এন এস জী হাব'-ও কিছু করতে পারবে না। আবার একটা ২৬/১১ যাতে না হয়, সরকারের চেতনা ফেরাতে তার জন্য প্রার্থনা ছাড়া কী উপায় আছে।

সানিয়া নয়, সাইনাতে মজুক দেশবাসী

সানিয়া মির্জা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। একই শহরের দুই নারী, অথচ চিন্তা, আচার-আচরণ, ক্রীড়াগত দক্ষতা তথা সাফল্যের মাপকাঠিতে কী অদ্ভুৎ বৈপরীত্য। একজন কিছু না করেই সবসময় প্রচার ও গ্ল্যামারের আলোকবৃত্তে থাকেন, অন্যজন বিশ্বের প্রথম দশে স্থান করে নিয়েও এদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে অপরিচিত। এভাবেই ব্যাখ্যা করা উচিত সানিয়া মির্জা ও সাইনা নেওয়ালের জীবনালেখ্যকে। বয়সে প্রায় কাছাকাছি কিন্তু পারফরম্যান্সের ঔজ্জ্বল্যে সানিয়াকে কয়েক লক্ষ মাইল পিছনে ফেলে দিয়েছেন সাইনা।

সানিয়া ভারতীয় মিডিয়ার সুনজরে পড়েন ২০০৩-এ দেশে ও বিদেশে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জার টুর্ণামেন্টে সাফল্য পাওয়ার দৌলতে। তার পরের বছর ডব্লু টি এ সার্কিটে আত্মপ্রকাশ করেন এবং যথারীতি দেশের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের চোখের মণি হয়ে ওঠেন। ২০০৫ -এ অবশ্য একটি ডব্লু টি এ খেতাব জয় ও দুটি টুর্ণামেন্টে সেমিফাইনালে ওঠেন। গ্রান্ডস্লাম ইভেন্ট যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত এগোতে সক্ষম হন। ব্যাস এতেই সানিয়া গোটা দেশে তুমুল জনপ্রিয়তা ও বিজ্ঞাপন জগতের 'ব্লু আইড গার্ল' হয়ে যান। তারপর থেকে বিশ্ব টেনিসে সানিয়া আর ব্যর্থতা সমার্থক।

টানা তিন বছর মেয়েদের আন্তর্জাতিক সার্কিটে বলার মতো কোনও পারফরম্যান্স নেই সানিয়ার। কিন্তু তাতে তার সারা বছর খবরের শিরোনামে থাকা ও নানা সূত্র থেকে অর্থাগমের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা যায়নি। অন্যদিকে সাইনা যে কিনা তার একই শহরের প্রতিবেশী পরের পর আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্টে ফাইন্যালে ওঠেন, কোনও ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়নও হয়ে যায়। এমনকী বিশ্ব অলিম্পিকে পর্যন্ত শেষ আট-এ পৌঁছন। কিন্তু তার ভাগ্যে কোনও স্পনসর জোটে না। এত কীর্তি সাধন করে খবরের কাগজে তার জন্য বরাদ্দ মাত্র দু-চার লাইন। তবে আশার কথা বেশ কয়েকটি বড় শিল্পসংস্থা মোটা টাকার চাকরির অফার করেছে সাইনাকে। বছর কুড়ির সাইনা অবশ্য চাকরি নিয়ে নিজের খেলার সর্বনাশ করতে চান না।

তাকে যে বিশ্বসেরা মহিলা খেলোয়াড় হতে হবে। ডেনমার্ক, সুইডেন, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, কোরিয়ান মেয়েদের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টনকে সম্মান ও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে তুলে ধরতে হবে। আমি ঘিয়া, মধুমিতারা শত চেষ্টা করেও যা করতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটা স্তর পর্যন্ত গিয়ে আটকে যান তারা। এদের সবাইকে অনেক কম বয়সে ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে গেছেন সাইনা। দরকার নেই তার জন্য মাত্রাতিরিক্ত প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ঝলকানি। দেশবাসী চায় না এসব পেয়ে তার অবস্থা সানিয়া মির্জার মতো হোক।

সাইনা নেওয়াল

প্রকাশ পাড়ুকোন, সৈয়দ মোদী, পুল্লেলা গোপিচাঁদরা পুরুষদের বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে ভারতকে গরিমামন্ডিত করেছেন। একমাত্র মহিলা হিসেবে তাদের যথার্থ উত্তরসূরী হয়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে সাইনা নেওয়াল।

শব্দরূপ - ৪৯৪

গীতাঞ্জলী পাল

১	■	■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■	৬	৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮		৯	■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. আলঙ্কারিক অর্থে ভালো-মন্দ কান্ডজ্ঞানহীন, শেষ দুয়ে দৃষ্টিহীন, ৪. আরবি শব্দে বহুবচনে মণিমুক্তাদি বহুমূল্য রত্ন, ৬.ক্ষুদ্র লতা, ৮."পোস্টমাস্টার" গল্পের ছোট মেয়েটি, ১০. সক্রন্দন হইচই, তিনে জননী, ১২. বিশেষণে অবিকল, যথাযথ, পাকাপাকিভাবে স্থিরীকৃত।

উপর-নীচ ঃ ১. তৎসম শব্দে পর্ণকুটির, কুঁড়েঘর, প্রথম দুয়ে বঙ্গীয় ক্যামেল, ২. আরবি শব্দে নিশান, তাজিয়া, ৩. "ওগো — নয়না হরিনী", ৫. বিশেষণে দখলীকৃত, করায়ত্ত, অধিকৃত, ৭. স্বর্গীয় এক অপ্সরা, শেষ ঘরে মাতা, ৯. পাপীদের শাস্তিভোগের স্থান, ১০. বিশেষণে হৃদয় সম্বন্ধীয়, আন্তরিক, ১১. বিশেষণে অপরিচিত, বিশ্বাসের অযোগ্য।

সমাধান শব্দরূপ ৪৯২

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	কা	■	■	ক	ন্ট	কী
■	■	ক	লা	ধ	র	■	চ
■	কি	■	য়	■	ক	ট	ক
না	ক	কা	ন	■	ম	■	■
■	■	বা	■	ক	ল	ম	চি
গ	রি	ব	■	পা	■	ক্ষী	■
র	■	চি	পি	ট	ক	■	■
ব	উ	নি	■	■	লি	■	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যায়।

এলিটে উঠেও বাংলা ব্যর্থ হল কেন ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দু'বছর পরপর রনজি ট্রফির ফাইনাল খেলার পরের বছরই এলিট থেকে অবনমিত হয়ে প্লেটে খেলা এমন অবিশ্বাস্য ঘটনার সাক্ষী বাংলার ক্রিকেট সমাজ। আবার তার পরের সিজনেই প্লেট চ্যাম্পিয়ন হয়ে এলিটে ফিরে আসায় বাংলার মুখরক্ষাও হল বটে, কিন্তু প্রথম ম্যাচেই পদস্খলন। শক্তিশালী বাংলা ব্যাঙ্গালোরে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে এগিয়েও খেলা থেকে ছিটকে গেল। চরম নাটকীয়তায় ভরা উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি বাংলা কেন ধরে রাখতে পারল না?

বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে এই ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত করতে বসলে, প্রথমেই উঠে আসে কোচ উৎপল চ্যাটার্জির সঙ্গে প্রধান নির্বাচক সম্বরণ ব্যানার্জির মনোমালিন্য। কোচ উৎপলকে দল নির্বাচনে না ডেকে সবচেয়ে বড় ভুলটি করেছে সি এ বি নির্বাচকরা। এজন্য সর্বাগ্রে দায়ী করতে হবে সম্বরণকে। ব্যক্তিগত ইগোকে গুরুত্ব দিয়ে আগের ঝামেলার কথা মাথায় রেখে সম্বরণ সি এ বি-কে প্রভাবিত করেছে, উৎপলকে না ডাকার ব্যাপারটি বাস্তবায়িত করতে।

যে উৎপল বাংলার জন্য দু'দশক লড়ে ঝুরি ঝুরি উইকেট নিয়েছেন, প্রয়োজনে ব্যাট হাতেও নির্ভরতা দিয়েছেন, তাকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ন্যূনতম স্বীকৃতি দেয়নি। তার থেকে অনেক অযোগ্য ক্রিকেটার দেশের হয়ে বহু ম্যাচ খেলে গেছেন ভালো পারফরম্যান্স

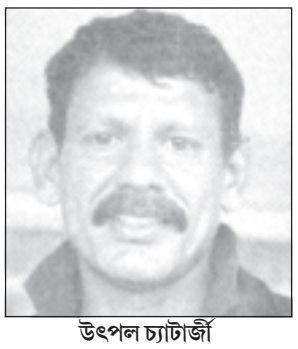

উৎপল চ্যাটার্জী

ছাড়াই।

এবার তার নিজের রাজ্যই তাকে বঞ্চ না করল। একবার নয়, বেশ কয়েকবার দলের নির্বাচনী সভায় উৎপলকে ডাকা হয়নি। অথচ নির্বাচনী সভায় কোচের মতামতই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত। কারণ কোচ তার খেলোয়াড়দের হাতের তালুর মতো চেনেন। আর উৎপলও সি এ বি লিগ, নক আউটের প্রায় সব ম্যাচ মাঠে বসে দেখেন। সদ্য খেলা ছেড়েছেন। আধুনিক ক্রিকেটের খুঁটিনাটিও নখদর্পণে। তার পছন্দমতো খেলোয়াড় নিয়ে দল নির্বাচন করলে হয় তো তামিলনাড়ু ম্যাচ বের করে নিতে পারত বাংলা। বিশেষ করে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে তার পছন্দের রোহন ব্যানার্জি। যে কিনা এ বছর খুব ভাল ফর্মে আছে। তামিলনাড়ুর নতুন বল আক্রমণ সামলাবার ক্ষেত্রে অবশ্যই অরিন্দমের থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি হতে পারতেন। মিডল অর্ডারেও শ্রীবৎস গোস্বামীকে খেলানো যেত স্বচ্ছন্দে। যুব বিশ্বকাপে চাম্পিয়ন ভারতীয় দলের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান যে কোনও ভূমিকাতেই বাংলা দলে আসার যোগ্য।

আর মাঠের বাইরের উৎপল-সম্বরণ মনোমালিন্য প্রভাব ফেলেছে মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়দের মনে ও পারফরম্যান্সে। স্পষ্টতই দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে গেছিল বাংলা দল। সিনিয়র মনোজ তেওয়ারি, রণদেব বসু, অধিনায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লারা এই বিভেদ-বৈষম্য সামলাতে ব্যর্থ হয়েছেন। আর অধিনায়ক নিজে এই বড় ম্যাচে সেভাবে পারফর্ম করতে পারেননি। লক্ষ্মীরতন বরাবরই বিগ ম্যাচ প্লেয়ার। এবার কিন্তু ব্যাটে বলে চরম ব্যর্থ হয়েছেন লক্ষ্মী। মনোজের অসাধারণ সেঞ্চু রি, রণদেবের চমৎকার সুইং বোলিংও তাই বাংলাকে বাঁচাতে পারল না।

লাঠিনৃত্যের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সুতপা প্রধান

বাংলাদেশের লাঠিখেলা নাচের ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সুতপা প্রধান। ঢাকায় ভারতীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের লাঠিনাচের উন্নয়ণ ভাবনা থেকে উৎসারিত' শীর্ষক কর্মশালায় তিনি এ প্রশিক্ষণ দেন। পাঁচ দিনের এক কর্মশালার আয়োজন করেছে উপমহাদেশী সংগীত ও নৃত্য প্রসার কেন্দ্র সাধনা।

কর্মশালায় অংশ নিয়েছে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও ময়মন সিংহ জেলার ১৫ জন গ্রামীণ লাঠিয়াল এবং ভারতের মেদিনীপুরের দু'জন বাদ্যকার-নৃত্যশিল্পী।

সাধনার পরিচালক নৃত্যশিল্পী লুবনা মারিয়ম বলেন, 'বাংলাদেশে লাঠি খেলাকে মূলত সমরকলা হিসেবেই জানি। কিন্তু এ নাচের কাঠামো নিয়ে আমরা শহুরে নৃত্যশিল্পীরা তেমন ভাবি না, আবার গ্রামীণ লাঠিয়ালেরাও জানে না যে, তারা একটা শিল্পধারার ধারক ও বাহক।' এ পরিস্থিতিতে আমরা এই কর্মশালার মাধ্যমে উভয় পক্ষের একটা যোগসূত্র রচনা করতে চেয়েছেন সুতপা প্রধান। তিনি বলেন, 'কর্মশালার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চ লের লাঠিখেলা দেখার সৌভাগ্য হল। আমার পশ্চি মবঙ্গের লাঠিখেলার সঙ্গে বাংলাদেশের লাঠিখেলার কিছু মিল থাকলেও এখানে বৈচিত্র্যটা একটু বেশি।

বাংলাদেশের নৃত্যধারা আধুনিক নৃত্যশিল্পে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, এ কর্মশালার মাধ্যমে আমি তাই দেখাতে চেয়েছি।

অনুপ্রবেশ ঃ বিজেপির নিরবচ্ছিন্ন হুঁশিয়ারি এবং লালবাদীদের ঘুমভাঙা কণ্ঠস্বর

বিশাখা বিশ্বাস

সাক্ষাৎ সমরে বিদেশ বিজয় আর সম্ভব নয় সাম্প্রতিক সময়ে। জটিল ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যার গরিষ্ঠতা অর্জন অতিশয় সময় সাপেক্ষ। জন্মহারের বল্গাবিহীন বৃদ্ধি র দ্বারা বিধর্মী গরিষ্ঠ বিদেশে জনসংখ্যার বিন্যাস বদল বহু কাল-সাপেক্ষ ব্যাপার। সময় স্থিতিশীল রইছে না, সে দ্রুত বদলাচ্ছে, বিশ্ব পরিস্থিতিকেও বদলে দিচ্ছে। কৃপাণাভিযান, ধর্মান্তরকরণ এবং জন্মহার বৃদ্ধি র সাবেকী কৌশলগুলি বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের ক্রমস্ফূরণে দ্রুত অকার্যকরী হয়ে চলেছে। যে ভ্যাটিক্যানী পোপ ধর্মীয় আগ্রাসনে সমগ্র এশিয়াকেই টার্গেট বলে সগর্বে একদিন দিল্লীতে ঘোষণা করেছিলেন — সর্বত্র তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, টিকে রয়েছে কেবল সেকুলার ভারতবর্ষে। তাই নতুন পথের অন্বেষণ চাই। দিন বদলের দ্রুততার সঙ্গে পথ পরিবর্তনের দ্রুততাও চাই। 'ঘোরী'-র চেয়েও দ্রুততর পথের অস্ত্রের সেই নাম 'অনুপ্রবেশ'। ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ চলছে, চলবে।....

পূর্ব-পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারীদের জন্যে খুলে রাখা পশ্চিমবাংলার পূর্ব সীমান্তের 'বুলন্দগেট' দিয়ে হাজার হাজার মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা এ রাজ্যে ১৯৮০ সালে ছিল ষাট লাখের ওপর, তার প্রায় চৌদ্দ বছর পরে ১৯৯৪ সালে লালবাংলার সংখ্যাতাত্ত্বিক কমরেড মানব মুখার্জী ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলিমগণ দেশের জনসমষ্টির সম্প্রদায়গত জনবিন্যাসকে পাল্টে দিচ্ছে এই অভিযোগকে সামনে রেখে বিজেপি দেশ জুড়ে শোরগোল তুলছে। পশ্চিমবাংলার লালপন্থী 'ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষ' মানুষগুলোর মধ্যে যারা শিরায় শিরায় মুসলিম কিন্তু পৈতেতে হিন্দু তাদেরই স্বগোত্রীয় শৈলেন দাশগুপ্ত বললেন, হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি যথেষ্ট ধূর্ত... পশ্চিমবাংলায় তাই তারা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নামক প্রশ্নটিকে বেছে নিয়েছে। লালপন্থীদের আর এক গোত্রের ধর্মান্তরিত মুসলিম কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত খোদ ভারতবর্ষের সংসদ-অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে বললেন, ওপারে বাঙালি এপারে বাঙালি, আমরা তো অনুপ্রবেশ দেখি না (তিনটি বক্তব্যেই মার্কসবাদী 'অথরিটি' লেখিকার কাছে রয়েছে)... ।

আজ একবিংশ শতাব্দীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে সেইসব লালপক্ষীগুলির দিকভ্রান্ত ঝাঁকভ্রষ্ট 'বুদ্ধীশ্বর' নামক বিহঙ্গটি যখন চিৎকার করছেন যে, অনুপ্রবেশ বাংলায় এক ভয়াবহ সমস্যা-র সৃষ্টি করেছে — তখন কমরেড শৈলেন দাশগুপ্ত স্বর্গলোকে শান্তির শয্যাতলে শয়ান, কমরেড (জনাব) ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কবরতলে নিদ্রাচ্ছন্ন। কমরেড মানব মুখার্জী মৌনীবাবা সেজে এ ব্যাপারে এখন বাক্যহীন, বচনহারা। কেবল সেদিনের সেই ষাট লক্ষ অনুপ্রবেশকারী আজ দেড় কোটির কাছাকাছি পৌঁছে মরূদ্যানের গোলাপবাগে ঢুকে ফুলের ডালে রোমশ হাতে পাঁপড়ি পিষ্ট করে চলেছে। কোমরবন্ধে বিষের ছুরি বেঁধে বাংলাজুড়ে বজ্জাতি করে চলেছে (মরূদ্যানের পুলিশ মেট্রোরেলের যাত্রীব্যাগে হাত ঢোকাও, রাজার ঘন্টা চবিবশ প্রহরই তোমাদের সেই দক্ষতা দেখাবে)'! বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা নিয়ে তৈরি হয়ে গেছে হিন্দুস্তানের ভেতরের পাকিস্তান। জলপাইগুড়ি এবং বীরভূমের প্রত্যেক জেলার নয়টি করে ব্লকে, দক্ষিণ চবিবশ পরগণার একুশটিতে, কোচবিহারের প্রত্যেক ব্লকে হিন্দু জনবৃদ্ধির হারের চেয়ে মুসলিম জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার দ্বিগুণের বেশি ছিল একানববই সালে — বিগত আঠারো বছরে তা কত হয়েছে তা পরে আরেকদিন আলোচিত হবে।

জনবিন্যাস বদলের এই সামান্য ও সহজ বিবরণের অসামান্য এবং ভয়ঙ্কর দিক হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলের অনেক ক্ষেত্র থেকেই কিছু বে-আইনী মাদ্রাসা এবং মৌলবাদী ধ্যান-ধারণার দ্রুত পরিবৃদ্ধির উদ্বেগজনক খবর রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নাকি পৌঁছে চলেছে। এখবরও নাকি রয়েছে, বিদেশী এমনকী কিছু দেশী জেহাদী ক্যাডারদেরও ওইসব জায়গায় নিরাপদ ডেরা বানাবার। বাংলাদেশী জেহাদী নেতৃমন্ডলীর বাক্-বক্তৃতায় অডিও-ভিডিও ক্যাসেট এবং নানান পুস্তকাদি পাচার হয়ে আসছে সেসব জায়গায়। ইসলামী মৌলবাদী এই নেটওয়ার্ক বিস্তার লাভ করে ফেলেছে বাংলা-বিহার ঝাড়খন্ডের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। এই সাথে যুক্ত হয়েছে রাজ্যের নানাস্থানে সিমির দেশবিরোধী ব্যাপক কার্যকলাপের বিস্তৃতি।...

লালঝান্ডার তলায় বসে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর-লালগড়ের মাটিতে যারা কেবল মাওবাদী ভূত দেখে চলেছে, তাদের চোখে পড়ছে না কেমন করে সুব্রত বায়েন নামের আড়াল নিয়ে অনুপ্রবিষ্ট ফতে আলিরা পনেরো বিঘে জমির ওপর পুকুর কেটে, মাঝখানে দোতলা বাড়ি বানিয়েছে। নিকটবর্তী থানাকে জেনারেটর উপহার দিয়েছে।

বাংলার বুদ্ধীশ্বর নামক শুভ্রকেশ শুভ্রবেশ 'নাটুকে নটবরটির' বাড়ির পাশেও দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করেছে এবং ভয়ঙ্কর সব অপকর্মগুলি ভারতের বুকে বসে 'ফতে' করে চলেছে — কেননা, 'আমাদের গর্ব' বাংলার পুলিশ নিয়ে প্রসূন মুখার্জীরা জনসংযোগ বাড়িয়ে ফুটবল খেলে চলেছেন। জয়বাবা বুদ্ধি র বৃহস্পতি।....

দেশের বুদ্ধির বৃহস্পতিরা একা নন। তাদের সাথে আছেন শিখ-শুক্রাচার্য— যিনি ভারতবর্ষের সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে, শতকরা আশিজন হিন্দুর রক্তে অর্জিত অর্থে পুষ্ট ও পরিচালিত কুর্সিতে বসে, নির্লজ্জ কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করে চলেছেন, 'দেশের সম্পদের ওপর মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার সর্বোচ্চ এবং সর্বাগ্রে'.... ।

অতএব, ভয় নাই রে 'কুট্টিভাই' — সত্বর আয় 'দার-উস্-সালাম' গড়তে হাত লাগাই। সারা বাংলার বর্ডার জুড়ে ভারত-অভ্যন্তরের প্রায় পাঁচ মাইল হিন্দুস্তান। মোটা টাকার অঙ্কে চলেছে সীমান্ত বিক্রয়। সেসব জায়গায় তৈরি হয়েছে শতশত 'স্লিপার-সেল' এবং 'মডিউল'। রাজ্যের অভ্যন্তরে হরেক নামের আড়ালে রচিত হয়ে গেছে নানান 'ট্র্যানজিট ক্যাম্প'। বর্ডার সংলগ্ন বিরাটাকার বেসরকারি স্বধর্মী-বিধর্মী পরিচালিত নানান জাতের চিকিৎসা সদনগুলিতে প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে শতশত বাংলাদেশী বৈধ-অবৈধ নাগরিকগণের সন্তান — জন্মসূত্রে যারা পেয়ে যাচ্ছে ভারতীয় নাগরিকত্ব। ভারতীয় বর্ডার-জেলাগুলিতে দরিদ্র ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ভাতে ও কাজে ভাগ বসাচ্ছে বাংলাদেশী অনুপ্রবিষ্ট এই মুসলিমগণ। বঙ্গীয় জেলখানাগুলিতে হাজার হাজার অনুপ্রবিষ্ট মুসলিম। বসে বসে খাচ্ছে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ভাত। সুলভে ও সহজেই ভোটের আগে এরা পেয়ে যাচ্ছে নাগরিকত্ব, রেশনকার্ড, বিপিএল-এর সুবিধা — অর্থনৈতিক দানসূত্রগুলির ক্ষেত্রে এরাজ্য এখন সত্যিই সরস 'মরূদ্যান'। মরূদ্যানের জেলখানা-গুলিতে বহাল তবিয়তে রাজ্যের অন্ন ধবংস করছে ধরা পড়া এগারো হাজার বাংলাদেশী মুসলমান।...

ও ভাইরে, আয়রে। লড়কে লিয়া পাকিস্তান। (এখন) হস্কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান! 'কুট্টি-ভাই'দের দেঙ্গে (বৃহত্তর)! সময় বয়ে এবং বদলে যায়রে .... ও আয়রে.... ।

"ভারতীয় বর্ডার-জেলাগুলিতে দরিদ্র ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ভাতে ও কাজে ভাগ বসাচ্ছে বাংলাদেশী অনুপ্রবিষ্ট এই মুসলিমগণ। বঙ্গীয় জেলখানাগুলিতে হাজার হাজার অনুপ্রবিষ্ট মুসলিম। বসে বসে খাচ্ছে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ভাত। সুলভে ও সহজেই ভোটের আগে এরা পেয়ে যাচ্ছে নাগরিকত্ব, রেশনকার্ড, বিপিএল-এর সুবিধা — অর্থনৈতিক দানসূত্রগুলির ক্ষেত্রে এরাজ্য এখন সত্যিই সরস 'মরূদ্যান'।"

রাজস্ব সংগ্রহের হাল-হকিকৎ

(৩ পাতার পর)

গত অক্টোবর ৩১ তারিখে আকরিক লৌহার রপ্তানীর ওপর সরকার প্রতি টনে ২০০ টাকা করে লেভি চাপিয়ে দিয়েছে। এর ফলে রপ্তানী তা কমেইছে উপরন্তু ছোট ছোট অনেক কোম্পানী লাটে উঠেছে। যেখানে এপ্রিলে আকরিক লৌহের দাম ছিল ১৫০-২০০ ডলার প্রতি টন, এখন সেই দাম নেমে গেছে। ইস্পাতের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সস্তার আমদানী করা ইস্পাতে বাজার ছেয়ে গেছে। কে কিনবে SAIL' এর বেশী দামের ইস্পাত। Export duty চাপিয়ে দেওয়ায় বিদেশী বাজারও হারিয়েছে। এক কথায় UPA সরকার দেশের শিল্পকে ইচ্ছে করেই যেন ধবংস করতে নেমেছে। শিল্প ক্ষেত্রে এই মন্দার ফলে শিল্প উৎপাদনের সূচক ও (Index for Industrial Production) মারাত্মকভাবে কমে গেছে। সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ যেখানে সূচক ছিল ৯.৫ শতাংশ সেখানে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে তা কমে দাঁড়ায় ৪.৮ শতাংশে।

এবারে UPA সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের নমুনা দেখিয়ে এই লেখাটি শেষ করব। সরকারের বার্ষিক বাজেট তৈরি হয় এই রাজস্বের উপরে। রাজস্ব হল সরকারের আয়। আয় অনুযায়ী ব্যয় ধরা হয়। তাই আয় অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এই রাজস্ব আসে বিভিন্ন ট্যাক্স, শুল্ক, লেভি প্রভৃতি থেকে। কিন্তু দুঃখের কথা এই রাজস্ব সংগ্রহ কোনও দিনই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারে না। কারণ কিছুটা রাজনৈতিক দুর্নীতি, কিছুটা প্রশাসনিক দুর্নীতি আর বেশীর ভাগটাই হল ভুল শিল্পনীতি। শিল্পপতিরা সরকারের কোষাগারে রাজস্ব দেওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কোষাগারে অর্থ দেওয়াটাই বেশি পছন্দ করে। আর মাঝখানে রয়েছে রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলাবাহিনী। তারাও সরকারি কোষাগারের চেয়ে নিজ পরিবারের কোষাগার স্ফীত করতেই বেশি প্রয়াসী। আর একটি কারণ হল উৎপাদনে মন্দা বা বাধা। উৎপাদন কম হলে উৎপাদন শুল্ক তো কম সংগৃহীত হবেই। আয় কম হলে আয়কর সংগ্রহ কম হবে। বিক্রয় কম হলে বিক্রয়কর কম সংগৃহীত হবে। আমদানী শুল্ক, সীমা শুল্ক (Custom Duty) কমিয়ে দিলে রাজস্ব কম সংগৃহীত হবে এই খাতে। আবার রপ্তানী শুল্ক বাড়িয়ে দিলে রপ্তানী কমে যাবে, পরিণামে রপ্তানী শুল্কও কম সংগৃহীত হবে। অতএব বাজেটে ঘাটতি। ঘাটতি মেটাতে বিদেশী ঋণ আর বিদেশী ঋণ, মেটাতে বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডার ক্রমশ নিঃশেষ করা।

মনমোহন সরকারের শিল্পনীতি দেশের শিল্পকে ধবংস করেছে। তার প্রমাণ রাজস্ব ঘাটতি। প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ ২০০৭'র নভেম্বর যেখানে ছিল ১৬,১৮৯ কোটি টাকা, সেখানে ২০০৮'র নভেম্বর'র-এর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১০,৩৪৬ কোটি টাকায়। অর্থাৎ ৩৬.০৯ শতাংশ কম। কর্পোরেট ট্যাক্সও কমে দাঁড়িয়েছে ৫,৭৮৫ কোটি টাকায়। গত নভেম্বরে '০৭ ছিল ৮,৪৪৮ কোটি টাকা। কমেছে ৩১ শতাংশ। অপ্রত্যক্ষ করের মধ্যে অক্টোবর '০৭ এর তুলনায় কাস্টমস ডিউটি অক্টোবর'০৮ পর্যন্ত কমেছে ০.৯ শতাংশ, এক্সাইজ ডিউটি কমেছে ৮.৭ শতাংশ। মোট অপ্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ ২০০৭-এর অক্টোবরে ১৯,৬৪৬ কোটি থেকে অক্টোবর '০৮-এ কমে দাঁড়িয়েছে ১৮,৬৬৪ কোটি টাকায়। বছরের শেষে কত নামবে সহজেই তা অনুমান করা যাচ্ছে। কারণ ইস্পাত, তুলো, উল প্রভৃতি শিল্প রপ্তানীতে চলছে চূড়ান্ত মন্দা। বিমান বন্দরের রাজস্ব কমতে চলেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। এইহল কংগ্রেস শাসনের হাল হকিকত।

অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডে শ্রীশ্রীরবিশঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ৭ জানুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল এন এন ভোরা শ্রীঅমরনাথ শ্রাইন বোর্ড পুনর্গঠন করলেন। প্রসঙ্গত, জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপালই পদাধিকার বলে তুষারতীর্থ অমরনাথ মন্দির সমিতির সভাপতি।

নবগঠিত বোর্ডে ছয়জন নতুন সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম হল 'আর্ট অফ্ লিভিং' খ্যাত ধর্মগুরু শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কিত নোটিফিকেশন ইস্যু করা হয়েছে। সমিতির অন্য সদস্যরা হলেন — রাজ্যসভার সাংসদ ডঃ কপিলা বাৎসায়ন, নতুন দিল্লীস্থিত বিজ্ঞান ও পরিবেশ গবেষণা কেন্দ্রের নির্দেশক সুনীতা নারায়ণ, জম্মু-কাশ্মীর উপভোক্তা আদালতের প্রধান বিচারপতি জি ডি শর্মা (অবসরপ্রাপ্ত), সেতার বাদক পন্ডিত ভজন সোপরি, সংস্কৃত বিদ্বান ডঃ বেদকুমারী ঘাই। এই সকল সদস্যদের কার্যাকালের মেয়াদ তিন বছর করে হয়। এঁদের মধ্যে বিচারপতি (অব) শ্রীশর্মা দ্বিতীয়বার অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের সদস্য হলেন। আগের সদস্যরা তাঁদের পদত্যাগপত্র রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন সদস্যরা প্রত্যেকেই সমাজজীবনের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

Swastika
19 January - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

সাড়ম্বরে স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৭তম জন্মদিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৭ তম জন্মদিবস গত ১২ জানুয়ারি সারা রাজ্য জুড়ে যথোচিত মর্যাদা ও আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল। মূল অনুষ্ঠানটি হয়েছে কলকাতায় সিমলা স্ট্রীটে স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবনে। এই উপলক্ষে এদিন এক বিশাল শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধীনে স্বামী বিবেকানন্দ পৈতৃক বাসভবন ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, স্থানীয় বিবেকানন্দ পাঠচক্র-এর সহযোগিতায় এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে। স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব ও ধর্মীয় সংগঠন এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নানা রঙের পোশাকে বাজনার তালে তালে এগিয়ে যাওয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দকে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া, কন্যাকুমারির শিলাখণ্ডে স্বামীজীর ধ্যানস্থ মূর্তি, চিকাগো ধর্মসভায় ভাষণরত স্বামীজী, মা সারদার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা, ভগবান মহাবীর, সশিষ্য আদি শংকরাচার্য ইত্যাদি ট্যাবলো ছিল উপভোগ্য। ভজন, কীর্তন, স্তোত্র পাঠ, ঠাকুর স্বামীজীর জয়ধ্বনি — সব মিলিয়ে পুরো শোভাযাত্রা ছিল মুখর।

উল্লেখ্য, এদিন সকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর কলকাতা শাখা শোভাযাত্রাসহ স্বামীজীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে।

দক্ষিণ কলকাতায় প্রভাত ফেরী

এছাড়া গত ১১ জানুয়ারির সকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতার অতি-দক্ষিণ ভাগের স্বয়ংসেবকরা এবং স্থানীয় হিন্দুত্বপ্রেমী যুবকরা গেরুয়া পতাকায় সুসজ্জিত ম্যাটাডোর গাড়িতে স্বামীজীর চিত্র নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে। এই শোভাযাত্রা বাঁশদ্রোণী বাজারে শুরু হয়ে টালিগঞ্জ শাখায় শেষ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শক্তিশেখর দাস। কলকাতার অতি দক্ষিণ ভাগ সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগ কার্যবাহ অচ্যুৎ কুমার গাঙ্গুলী এবং মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

শোভাযাত্রার একাংশ। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের ৫০০ বর্ষে আলোচনা

মঞ্চে বাঁদিক থেকে স্বামী অশোকানন্দ গিরি, স্বামী যুক্তানন্দ, অদ্বৈত আচার্য ও ডঃ বিধান বিশ্বাস।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, মহানাম সংকীর্তন প্রচার ও নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে গমনের ৫০০ শত বর্ষ পূর্ণ হবে আগামী বছর — ২০১০-এর জানুয়ারি মাসে। এই উপলক্ষে শহর-নগর-গ্রামাঞ্চলকে শ্রীশ্রী হরিনাম ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মোৎসব ও নগর সংকীর্তন সমিতির শিয়ালদহ শাখা এবং ৩৭-এর পল্লী হরিনাম সংকীর্তন সম্প্রদায় যৌথভাবে গত ১১ জানুয়ারি বিকালে কলকাতায় শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। এই সভায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী যুক্তানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, হিন্দুত্বের জাগরণ ও হিন্দু সংগঠনই বিধর্মী ও বিজাতীয় আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে পারবে।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার ভোলাগিরি আশ্রমের স্বামী অশোকানন্দ গিরি, ইস্কন-এর অদ্বৈত আচার্য প্রভু, অধ্যাপক ডঃ বিধানচন্দ্র বিশ্বাস, সোমনাথ নন্দী ও তপন ঘোষ। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন শিয়ালদহ শাখার সভাপতি শান্তিনাথ ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রবীর ভট্টাচার্য।

প্রকাশিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি '০৯
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি '০৯
প্রজাতন্ত্র সংখ্যা - ২০০৯
ষাট বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকৃত অর্থে প্রজাতন্ত্র এখনও অনেক দূরে। প্রজাতন্ত্রের নামে যা চলছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ধান্ধাবাজ রাজনীতি ও গুন্ডারাজ তন্ত্র। পেশী ও অর্থ বলের কাছে সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ। সেইসঙ্গে বারবার সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় আক্রান্ত আমরা, বিপন্ন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। আক্রান্ত আমাদের বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র। এই পরিস্থিতির পটভূমিতেই এবারের বিষয় —
আক্রান্ত প্রজাতন্ত্র
-ঃ লিখেছেন ঃ-
ডঃ প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, মেঃ জেঃ (অবঃ) কে কে গাঙ্গুলি,কর্ণেল সব্যসাচী বাগচী, এন সি দে, গূঢ়পুরুষ প্রমুখ।
নিয়মিত সংখ্যার আকারেই প্রকাশিত হচ্ছে। দাম চার টাকা।
সত্বর কপি বুক করুন।

বিবেকানন্দ সেবাসম্মানে ভূষিত স্বামী সোমগিরিজী

স্বামী সোমগিরি মহারাজকে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন ডঃ বিজয় বাহাদুর সিং। পাশে যুগল কিশোর জৈথলিয়া এবং নরেন্দ্র কোহলি।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। 'স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে আমাদের সংস্কৃতির উপর যেরকম আঘাত হচ্ছিল এখন আমাদের নিজেদের দেশের লোকরাই সেই সময়ের থেকে আরও বেশি করে আঘাত করছে। বর্তমান ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ন্যায়পালিকা (আদালত), বিধায়িকা (আইনসভা), কার্যপালিকা (প্রশাসন) — সকলকেই ভারতের মূল সংস্কৃতিকে জানতে হবে। প্রশ্ন ওঠে, এঁরা সবাই ভারতীয় সংস্কৃতিকে জেনেছেন কিনা! শ্রুতি, যুক্তি, অনুভূতি দিয়ে তা বুঝতে হবে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রমণ মহর্ষি — সকলের শিক্ষাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

গত ১১ জানুয়ারি কলকাতার প্রসিদ্ধ সমাজসেবামূলক সংস্থা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় কর্তৃক 'বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে' ভূষিত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী শ্রী সংবিত সোমগিরিজী মহারাজ উপরোক্ত কথাগুলি বলেন। এই ২৩ তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান-এর অনুষ্ঠান সকাল দশটায় কলকাতার প্রসিদ্ধ মহাজাতি সদন (অ্যানেক্স) সভাগারে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজী আরও বলেন, 'সঙ্ঘ শক্তি কলৌ যুগে'। সেজন্য সকলকে সঠিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে লড়াই করে যেতে হবে। লড়াই, সংগ্রামই জীবন।

এদিনের সভার মূল বক্তা দিল্লী থেকে আগত প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ নরেন্দ্র কোহলি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অনেক প্রেরণাদায়ক ঘটনা তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের গৌরবকে আমেরিকায় ইউরোপে পুনঃস্থাপিত করেছেন, আমেরিকানদেরকে বেদান্ত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত — প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনের পাঠ পড়িয়েছেন। ওখানে মঠ স্থাপন করেছেন, ওদেশের লোককে শুধু শিষ্য নয় — ব্রহ্মচারী তৈরি করেছেন। আর সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, বিদেশী পাদ্রীদের ভারতে কোনও দরকার নেই। ভারতের জনগণের উপর ইংরেজরা যে দমন-পীড়ন-অত্যাচার করেছে তা সারা ভারত মহাসাগরের কাদা তাদের গায়ে ছুঁড়ে মারলেও কম লাঘব হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রখ্যাত সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া। তিনি বলেন, দেশে এক অদ্ভুত মনোভাব তৈরি হয়েছে। হিন্দু নাম নিয়ে কিছু করলেই তাকে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু এদেশকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণ হলেই সম্ভব হবে। সভার শুরুতে মঞ্চস্থ সকলে স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। স্বামী সোমগিরি মহারাজকে মাল্যার্পণ করেন সমাজসেবী বিমল লাট। স্বামীজীকে শাল ও শ্রীফল তুলে দেন ডঃ নরেন্দ্র কোহলি। মানপত্র এবং সম্মান স্বরূপ ৫১ হাজার টাকার চেক তুলে দেন সভার সভাপতি তথা ভারতীয় ভাষা পরিষদ কলকাতা-র নির্দেশক ডঃ বিজয় বাহাদুর সিংহ। সভা পরিচালনা করেন পুস্তকালয়ের সভাপতি ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহাবীর বাজাজ। এদিন শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতীর কর্মকর্তা সুভাষ ভট্টাচার্য।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com